ইস্‌কনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র
অমৃতের সন্ধানে

"শ্রী প্রভুপাদ, আমার খুব অসুবিধা হচ্ছে, আমি পড়বার সময় পাচ্ছি না, আমি ঠিক মত জপ করতে পারছি না। আমি কৃষ্ণ সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারছি না। সব সময় আমার মাথায় ঘুরছে কিভাবে এই ঠিকাদারেরা আমাদের প্রতারণা করছে অথবা আমাকে চিন্তা করতে হচ্ছে মাল মশ্‌লা খরিদ করার অথবা মজুরদের টাকা দেওয়ার জন্য চেক্ সই করতে হবে। এই সমস্ত চিন্তা আমাকে অত্যন্ত বিচলিত করছে। এই সমস্ত চিন্তা আমাকে কৃষ্ণ সম্বন্ধে চিন্তা করতে দিচ্ছে না।" শ্রীল প্রভুপাদ উত্তর দিয়েছিলেন, "তুমি কি মনে কর কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুন কেবল শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করছিলেন ? তুমি কি মনে কর অর্জুন যোগাসনে বসে ধ্যানস্থ হয়েছিলেন, আর রণাঙ্গনে কৃষ্ণ সমস্ত কাজ করেছিলেন ? না, তিনি যুদ্ধ করছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্য হত্যা করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্য যে সমস্ত সৈন্যদের হত্যা করতে হবে তাদের কথা চিন্তা করছিলেন। "চেক্ বইয়ের কথা চিন্তা করা, লোক-জনদের কথা চিন্তা করা, ঠিকাদারদের কথা চিন্তা করা– অর্জুনের চিন্তারই মত। এটি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সেবা। সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে হবে না। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সামনে বসে তাঁর রূপের ধ্যান করছিলেন না। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত ছিলেন। তেমনই সেই কৃষ্ণ সেবাতেই তোমাকে যুক্ত হতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যখন জীবন পূর্ণ হয় তখন জীবন সার্থক হয়।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)-এর
প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

শ্রীশ্রী গুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অমৃতের সন্ধানে

ইস্‌কনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(কেবলমাত্র সদস্যদের জন্য)

ত্রয়োদশ বর্ষ ▶ প্রথম সংখ্যা ▶ জানুয়ারী ▶ ফেব্রুয়ারী ▶ মার্চ ২০০৮ ইং

প্রতিষ্ঠাতা ঃ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) এর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের নির্দেশানুসারে, বাংলাদেশ ইস্‌কন গভর্নিংবডি কমিশনার ও গুরুবর্গের কৃপায়

সম্পাদক ঃ শ্রী চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী
নির্বাহী সম্পাদক ঃ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ দাস ব্রহ্মচারী
সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রী রামেশ্বর চরণ দাস ব্রহ্মচারী

বাংলাদেশ ইস্‌কন ফুড ফর লাইফ কর্তৃক প্রকাশিত

প্রধান উপদেষ্টা ঃ শ্রী ননী গোপাল সাহা
বিশেষ উপদেষ্টা ঃ শ্রী সত্যরঞ্জন বাড়ৈ, অবসরপ্রাপ্ত ডি আই জি (কারাগার)
পৃষ্ঠপোষকতায় ঃ শ্রী চিত্ত রঞ্জন পাল
শ্রী সুদর্শন কৃষ্ণ দাস

স্বত্ত্বাধিকারী ঃ ইস্‌কন ফুড ফর লাইফ

ভিক্ষা মূল্য ঃ প্রতিকপি-২০.০০ টাকা
এবং বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা
রেজিঃ ডাকে – ১১০.০০টাকা

কম্পিউটার গ্রাফিক ডিজাইন ঃ প্রসেনজিৎ রাজবংশী ভক্ত

যোগাযোগ করুন
'ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে'
৭৯, ৭৯/১, স্বামীবাগ রোড, ঢাকা- ১১০০
ফোন ঃ ৭১২২৪৮৮, ০১৯১৭৫১৮৮২৭

❀ সূচীপত্র ❀

❊ প্রচ্ছদপট ❊

অরুণাম্বর-ধর-চারু-কপোলং ইন্দু-বিনিন্দিত-নখচয়-রুচিরম্।
জল্পিত-নিজগণ-নাম-বিনোদং তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥

যাঁর পরিধানে অরুণবসন, যাঁর সুন্দর গণ্ডদেশ ও নখকান্তি চন্দ্রকে নিন্দা করে, যিনি নিজের (শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণের) নাম, গুণ ও লীলা কীর্তন করেন অথবা নিজ নাম গুণকীর্তনে উল্লসিত হন, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি।

গৌরাব্দঃ ৫২১; বঙ্গাব্দঃ ১৪১৪; খ্রীষ্টাব্দ ঃ ২০০৮

তারিখ		বিবরণ
১২ই নারায়ণ, ১৯শে পৌষ, ৪ঠা জানুয়ারী ২০০৮, শুক্রবার	ঃ	সফলা একাদশীর উপবাস। শ্রীল দেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব।
১৩ই নারায়ণ, ২০শেপৌষ, ৫ই জানুয়ারী ২০০৮, শনিবার	ঃ	একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৬.৪২ মিঃ থেকে ১০.১৬ মিঃ মধ্যে।
১৭ই নারায়ণ, ২৪শে পৌষ, ৯ই জানুয়ারী ২০০৮, বুধবার	ঃ	শ্রীল লোচন দাস ঠাকুরের আবির্ভাব।
১৯শে নারায়ণ, ২৬শে পৌষ, ১১ই জানুয়ারী ২০০৮, শুক্রবার	ঃ	শ্রীল জীব গোস্বামী এবং শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব।
২৭শে নারায়ন, ৫ই মাঘ, ১৯শে জানুয়ারী ২০০৮, শনিবার	ঃ	**পুত্রদা একাদশীর উপবাস।** শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের আবির্ভাব।
২৮শে নারায়ণ, ৬ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী ২০০৮, রবিবার	ঃ	একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৬.৪৩ মিঃ থেকে ১০.২০ মিঃ মধ্যে।
৩০শে নারায়ণ, ৮ই মাঘ, ২২শে জানুয়ারী ২০০৮, মঙ্গলবার	ঃ	শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক
৫ই মাধব, ১৩ই মাঘ, ২৭শে জানুয়ারী ২০০৮, রবিবার	ঃ	শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের তিরোভাব ও শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী আবির্ভাব।
৬ই মাধব, ১৪ই মাঘ, ২৮শে জানুয়ারী ২০০৮, সোমবার	ঃ	শ্রীল জয়দেব গোস্বামীর তিরোভাব।
৭ই মাধব, ১৫ই মাঘ, ২৯শে জানুয়ারী ২০০৮, মঙ্গলবার	ঃ	শ্রীল লোচন দাস ঠাকুরের তিরোভাব।
১২ই মাধব, ২০শে মাঘ, ৩রা ফেব্রুয়ারী ২০০৮, রবিবার	ঃ	**ষট্‌তিলা একাদশীর উপবাস।**
১৩ই মাধব, ২১শে মাঘ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ২০০৮, সোমবার	ঃ	একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৬.৩৮ মিঃ থেকে ০৮.৪২ মিঃ মধ্যে।
২০শে মাধব, ২৮শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী ২০০৮, সোমবার	ঃ	শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত শ্রীপঞ্চমী। শ্রী সরস্বতী পূজা। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব, শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীল রঘুনন্দন দাস ঠাকুর ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আবির্ভাব। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের তিরোভাব
২২শে মাধব, ৩০শে মাঘ, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ২০০৮, বুধবার	ঃ	শ্রীল অদ্বৈত আচার্যের আবির্ভাব। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।
২৩শে মাধব, ১লা ফাল্গুন, ১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০০৮, বৃহস্পতিবার	ঃ	ভীষ্মাষ্টমী
২৫শে মাধব, ৩রা ফাল্গুন, ১৬ই ফেব্রুয়ারী ২০০৮, শনিবার	ঃ	**শ্রীপাদ রামনুজাচার্যের তিরোভাব**
২৬শে মাধব, ৪ঠা ফাল্গুন, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ২০০৮, রবিবার	ঃ	**ভৈমী একাদশীর উপবাস।**
২৭শে মাধব, ৫ই ফাল্গুন, ১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০০৮, সোমবার	ঃ	একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৬.৩০ মিঃ থেকে ১০.১৮ মিঃ মধ্যে।
	ঃ	শ্রী বরাহদেবের আবির্ভাব।
২৮শে মাধব, ৬ই ফাল্গুন, ১৯শে ফেব্রুয়ারী ২০০৮, মঙ্গলবার	ঃ	শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব। (দুপুর পর্যন্ত উপবাস)
৩০শে মাধব, ৮ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী ২০০৮, বৃহস্পতিবার	ঃ	শ্রীকৃষ্ণের মধুর উৎসব। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের আবির্ভাব।
৫ই গোবিন্দ, ১৩ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ২০০৮, মঙ্গলবার	ঃ	শ্রীল পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরের তিরোভাব। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব। শ্রীল গৌর গোবিন্দ স্বামীর তিরোভাব। (দুপুর পর্যন্ত উপবাস)
১১ই গোবিন্দ, ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ ২০০৮, সোমবার	ঃ	**বিজয়া একাদশীর উপবাস।**
১২ই গোবিন্দ, ২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ ২০০৮, মঙ্গলবার	ঃ	একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন, ৮.২২ মিঃ থেকে ১০.১৩ মিঃ মধ্যে। শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের তিরোভাব।
১৪ই গোবিন্দ, ২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ ২০০৮, বৃহস্পতিবার	ঃ	শ্রী শিবরাত্রি।
১৬ই গোবিন্দ, ২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ ২০০৮, শনিবার	ঃ	শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী এবং শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর তিরোভাব।
২৫শে গোবিন্দ, ৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ ২০০৮, সোমবার	ঃ	আমলকী ব্রত একাদশীর উপবাস।
২৬শে গোবিন্দ, ৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ ২০০৮, মঙ্গলবার	ঃ	একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৬.০৪ মিঃ থেকে ১০.০৬ মিঃ মধ্যে। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের তিরোভাব।
২৯শে গোবিন্দ, ৭ই চৈত্র, ২১শে মার্চ ২০০৮, শুক্রবার	ঃ	শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব। "গৌর পূর্ণিমা চন্দ্রোদয় পর্যন্ত নির্জলা উপবাস। পরে অনুকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

সাধুর লক্ষণ

– শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্বন্তি যে দৃঢ়াম্ ।
মৃৎকৃতে ত্যক্তকর্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ ॥

অনুবাদ

অনন্য ভাব সমন্বিত এই ধরনের সাধু ভক্তিদ্বারা ভগবদ্ভজনে দৃঢ়ব্রত হন। ভগবৎ-সেবার উদ্দেশ্যে তিনি পরিবার, পরিজন, বন্ধুরূপ এই জগতের সমস্ত সম্বন্ধই পরিত্যাগ করেন।

তাৎপর্য

যিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেছেন, তিনিও সাধু। কেননা তিনি তাঁর গৃহ, বিলাস, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, পরিবার, এবং বন্ধু ও পরিবারের প্রতি তাঁর কর্তব্য ইত্যাদি সব কিছুই পরিত্যাগ করেছেন। পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করবার জন্যই তিনি এই সব ত্যাগ করেন। সাধারণত একজন সন্ন্যাসী, ত্যাগীর জীবন যাপন করেন। কিন্তু তাঁর এই সংসার ত্যাগ তখনই সফল হবে, যখন কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছসাধনের মাধ্যমে তার সমস্ত-সামর্থ ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত হবে। তাই এই শ্লোকে 'ভক্তিং কুর্বন্তি যে দৃঢ়াম্' বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি জীবনের সমস্ত কিছু ত্যাগ করে, কেবল নিষ্ঠার সঙ্গে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকেন, তিনি সাধু বিবেচিত হন। তিনিই হচ্ছেন সাধু, যিনি শুধু ভগবানের সেবার জন্য সমাজ, পরিবার এবং মানব-হিতৈষীমূলক সমস্ত জাগতিক দায়িত্বগুলি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন। এই জগতে জন্মগ্রহণ করা মাত্র, জনগণের প্রতি, দেবতাদের প্রতি, মুনি-ঋষিদের প্রতি, সাধারণ জীবকুলের প্রতি, পিতা-মাতা, পূর্বপুরুষ এবং আরো অনেক কিছুর প্রতি একজন মানুষের নৈতিক দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা থাকে। পরমেশ্বর ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে যখন কেউ এই সমস্ত নৈতিক দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা ত্যাগ করে, তার জন্য তাকে কোন দন্ড ভোগ করতে হয় না। কিন্তু সে যদি কখনও ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য সব দায়িত্ব ত্যাগ করে, তবে প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী তাকে শাস্তি পেতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, এবং সমস্ত শাস্ত্রেও বলা হয়েছে যে, একমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা আমরা অনুগৃহীত। অতএব পরমেশ্বর শ্রীভগবানের সেবা করলে, আমরা আর কারো প্রতি ঋণী থাকবো না। আমরা মুক্ত হব। কীভাবে তা সম্ভব ? সর্বশক্তিমান ভগবানের কৃপাশীর্বাদ দ্বারা। কোন মানুষ মৃত্যু দন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হতে পারে, কিন্তু দেশের রাজা অথবা রাষ্ট্রপতি যদি তাকে ক্ষমা করে, সে রক্ষা পায়।
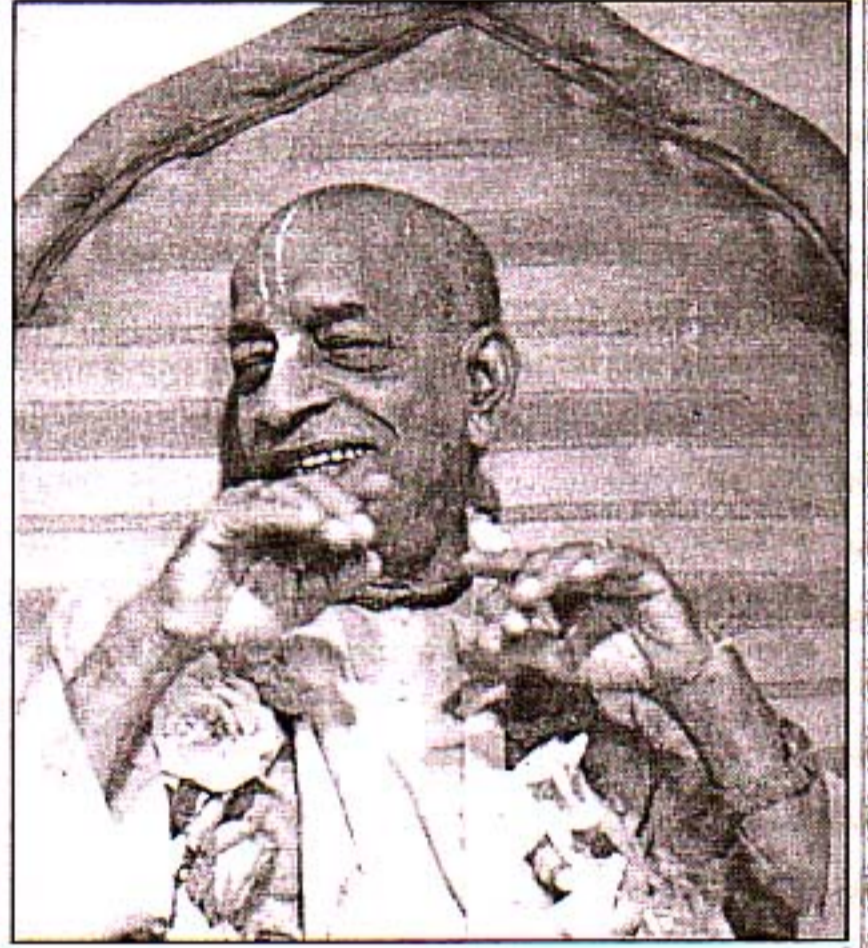
আমাদের সমস্ত কিছু তাঁর কাছে সমর্পণ করার জন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অন্তিম নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা আমাদের জীবন, ধন-সম্পদ, বুদ্ধি-মত্তা কৃষ্ণকে উৎসর্গ করতে পারি, আর একেই যজ্ঞ বলা হয়। সকলেরই বুদ্ধি রয়েছে এবং সকলেই কোন না কোন ভাবে তার বুদ্ধি প্রয়োগ করে। সাধারণত ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্যই মানুষ তার বুদ্ধিকে ব্যবহার করে, এমনকি একটি পিঁপড়ে পর্যন্ত তা করতে পারে। নিজেদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির চেষ্টা না করে, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করবার জন্য আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত। তাহলেই আমরা শুদ্ধ হতে পারব।

একজন সাধুর কাছ থেকে, এই শুদ্ধ পন্থা শিক্ষা লাভ করতে হবে। আমরা ইন্দ্রিয় ভোগের জন্য যতই সচেষ্ট হই ততই এই মায়িক জগতের বন্ধনে জড়িয়ে পড়ি। আমরা সাধু অথবা কৃষ্ণের সেবা করতে পারি। সাধু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। তিনি কখনও বলবেন না যে, 'আমার সেবা কর,' পক্ষান্তরে তিনি মানুষকে কৃষ্ণসেবা করার উপদেশ দেন। অতএব সাধুর মাধ্যমেই কৃষ্ণের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। এই কথা, বৈষ্ণব আচার্য নরোত্তম দাস ঠাকুরের কথায় প্রতিপন্ন হয়– 'ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা নিস্তার পাইয়াছে কেবা'। আমরা সরাসরি শ্রীকৃষ্ণ-সান্নিধ্য লাভ করতে পারি না। কৃষ্ণের প্রতিনিধি, শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃপার মাধ্যমেই আমরা তা লাভ করতে পারি।

যারা ভৌতিক সুযোগ-সুবিধা লাভের অভিলাষী, তারা তাদের অভিলাষ পূরণের জন্য বিভিন্ন দেবতার শরণাপন্ন হয়। শিব, দুর্গা, কালী, গণেশ, সূর্য এবং অন্যান্য দেবতাদের কাছ থেকে তারা কিছু কিছু ঈপ্সিত সুযোগ সুবিধা পেয়েও থাকে। কিন্তু একমাত্র দেবী পার্বতীই দেবাদিদেব শিবকে জিজ্ঞাসা করেন, 'শ্রেষ্ঠ আরাধনা কি? মহেশ্বর শিব উপদেশ দিয়েছিলেন, 'আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণুরারাধনং পরম্' (পদ্ম পুরাণ)। অর্থাৎ " হে দেবী পার্বতী, সমস্ত আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ। এরপর মহাদেব আরো বললেন, 'তস্মাৎ পরতরং দেবী তদীয়ানাং সমর্চনম্,' অর্থাৎ 'এমন কি বিষ্ণুর উপাসনার চেয়ে, একজন ভক্ত, একজন বৈষ্ণবের সেবা করা শ্রেষ্ঠতর।

ভগবদ্ভক্ত সাধুসঙ্গের মাধ্যমেই পারমার্থিক জীবনের সূচনা হয়। সাধুর কৃপা ছাড়া কেউ সামান্যতম পারমার্থিক উন্নতি লাভ করতে পারে না। প্রহ্লাদ মহারাজও সেকথা বলেছেন–

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

অর্থাৎ, যতক্ষণ না ঘোর জড়বাদি বিষয়ী মানুষ,নির্মল বৈষ্ণব পদরজ দ্বারা অভিষিক্ত হচ্ছে ততক্ষণ তারা ভগবান উরুক্রমের পাদপদ্মে নিবিষ্ট হতে পারে না।" কেবলমাত্র কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে পরমেশ্বরের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করার মাধ্যমে, মানুষ জড় আবদ্ধময়তা থেকে মুক্ত হতে পারে (ভাগবত ৭/৫/৩২)। হিরণ্য-কশিপু প্রহ্লাদ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "প্রিয় প্রহ্লাদ, তুমি কিভাবে এতবড় কৃষ্ণভক্ত হলে?" অসুর হলেও হিরণ্যকশিপু 'ভক্তি' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ছিল। প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তর দিয়েছিলেন, "হে অসুরশ্রেষ্ঠ পিতা, একমাত্র গুরুদেবের শ্রীউপদেশামৃত থেকেই একজন ভগবদ্ভক্তি প্রাপ্ত হয়। মনোধর্মী জ্ঞানালোচনায় তা অত্যন্ত দুর্লভ।" সাধারণত লোক জানে না যে, আমাদের অন্তিম স্বার্থ-গতি হচ্ছেন ভগবান বিষ্ণু। এই জড় জগতে সকলেরই কামনা-বাসনা আছে– তারা সকলেই সকাম কর্মী। নৈরাশ্যের মধ্যে তারা উচ্চাশাবাদী, তবুও তাদের আশা কোনদিনই পূর্ণ হবে না। জড়া-প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে জনগণ সুখী হওয়ার প্রয়াস করছে, কিন্তু তারা জানে না যে ভগবৎ শরণাগতি ছাড়া সুখ লাভ সম্ভব নয়। জনগণ মনে করছে– "সর্ব প্রথম আমার নিজ স্বার্থে যত্নবান হতে হবে ।" তা ঠিকই ; কিন্তু সেই নিজ স্বার্থ বলতে কি বোঝায় ? এ সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ন অজ্ঞ । লোকে মনে করছে ভৌতিক প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তারা জীবনে সুখী হবে , আর প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত , সমষ্টিগত বা জাতিগতভাবে এ বিষয়ে সচেষ্ট । কিন্ত তা হবার নয় । পরিশেষে জনগনের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে । নিস্ফল উদ্যোগে কেন এই প্রয়াস ? এই জন্য শাস্ত্রে উপদেশ হচ্ছে - অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম (ভাঃ ৭/৫/৩০) অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযমে অক্ষম ব্যক্তিদের সব জড় প্রয়াসই নানাভাবে ব্যর্থ হচ্ছে । তাদের একমাত্র আশ্রয় হচেছ ভগবান কৃষ্ণ । তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে - ময়ি অনন্যেন ভাবেন ভক্তিম কুর্বন্তি যে দৃঢ়াম ।

প্রহ্লাদ মহারাজ শুধু কৃষ্ণ স্মরণ করেছিলেন ; শুধু এই জন্য পিতার দ্বারা তিনি কঠোরভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন । ভৌতিক প্রকৃতি সহজে আমাদের মুক্তি দান করবে না । শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরনকমলে দৃঢ়ভাবে ধারন করলেও , মায়া আমাদের তার অধীন রাখার চেষ্টা করবে। কিন্তু কৃষ্ণার্থে সর্বস্ব নিবেদন করলে , মায়ামোহ আমাকে স্পর্শও করতে পারবে না । এর উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত ব্রজগোপীবৃন্দ । তাঁরা কৃষ্ণের অনুগামী হওয়ার জন্য - পরিবার, মান, সম্মান সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন । সেটাই হচেছ সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ , সাধারণের পক্ষে ঐ দৃষ্টান্ত অনুকরণীয় নয়। যাইহোক্ ষড় গোস্বামীদের কৃষ্ণোপাসনা পদ্ধতি আমাদের অনুসরণ করা উচিত।

সনাতন গোস্বামী হুসেন শাহের শাসনকার্যে একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ছিলেন; কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আশ্রয় লাভের জন্য তিনি সব কিছুই পরিত্যাগ করেন। তিনি বৈরাগ্যময় ভিক্ষুক জীবন গ্রহণ করে, প্রতিদিন বিভিন্ন গাছের তলায় কালাতিপাত করতেন। প্রশ্ন উঠতে পারে "সংসার ভোগ ত্যাগ করে কিভাবে জীবন-যাপন সম্ভব?" –কৃষ্ণ ও ব্রজগোপিকাদের লীলাবিলাসময় ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে অবগাহন করে গোস্বামীরা জীবন-যাপন করতেন। ব্রজের এই অপ্রাকৃত ভক্তিই ছিল তাঁদের প্রাণধন। এই জন্য তাঁদের জীবন ছিল শান্তিময়। আমরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সর্বস্ব ত্যাগ করতে অক্ষম। কৃষ্ণে অনন্য শ্রদ্ধা ছাড়াই সর্বস্ব ত্যাগের চেষ্টা করলে আমরা উন্মত্ত হয়ে উঠব। তবুও কৃষ্ণের অপ্রাকৃত সান্নিধ্য প্রাপ্তির ফলে আমরা ঐশ্বর্যময় পদ, আমাদের স্বজন-পরিবার, জীবিকা-বৃত্তি আদি সবকিছুই সহজে ত্যাগ করতে পারি। বস্তুত এইজন্য সাধুসঙ্গ, বা ভক্তসঙ্গ প্রয়োজন। ভক্তসঙ্গের ফলে এমন দিন উপস্থিত হবে যখন আমরা সর্বস্ব ত্যাগ করব এবং জীবনমুক্ত পুরুষ হয়ে ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের যোগ্য হব। এখন আমরা সকলেই সংসারভোগে আসক্ত; আর কৃষ্ণও ইন্দ্রিয়ভোগের জন্য আমাদের এক সুযোগ দান করেছেন।

ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য এই ভৌতিক জগতে আসায় ভগবান আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী ভোগের-সুযোগ দান করেছেন। বস্তুত এরই নাম 'মায়া'; এরই নাম 'মোহ'। তত্ত্বতঃ এটা মোটেই ভোগ সুখ নয়, শুধু সংগ্রাম মাত্র ; এই মায়িক জগতে বস্তুত কোন সুখ নেই, আছে শুধু বার বার জীবন সংগ্রাম; এই উপলব্ধি হলে একজন কৃষ্ণভক্তে পরিণত হন। কিন্তু এই উপলব্ধি জ্ঞানসাপেক্ষ আর কৃষ্ণভক্তের সান্নিধ্যে সেই জ্ঞান লাভ হয়।

ভগবান কপিলদেব এই ভবসংগ্রাম থেকে মুক্তি সম্বন্ধে পরবর্তী শ্লোকে আরও ব্যাখ্যা করেছেন—

মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্ তাপা নৈতান্ মদ্গতচেতসঃ ॥

অনুবাদ

নিরন্তর পূত হরিকথা শ্রবণ-কীর্তনরত সাধুগণ সংসার-ক্লেশ ভোগ করেন না, কারণ তাদের মন সবসময় আমার দিব্য লীলাবিলাসে নিমগ্ন।

তাৎপর্য

এই মায়িক সংসারে বহুবিধ দুঃখকষ্ট রয়েছে— প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা, অন্যজীব প্রদত্ত, মানসিক, দৈহিকাদি অনেক তাপক্লেশ আছে। এই রকম দুঃখজনক পরিস্থিতিতে সাধু বিচলিত হন না। কারণ তাঁর মন সবসময় কৃষ্ণভাবনাময়; তাই তিনি কৃষ্ণের দিব্য লীলা-কথা ছাড়া অন্য কিছু আলোচনা করতে চান না। মহারাজ অম্বরীষ হরিকথা ছাড়া অন্য কোন কথা বলতেন না। 'বাচাংসি বৈকুণ্ঠ-গুণানুবর্ণনে' অর্থাৎ, নিরন্তর তিনি ভগবানের গুণ কীর্তনেই নিয়োজিত ছিলেন। কৃষ্ণবিস্মৃত হয়ে মায়াবদ্ধ জীবকুল উদ্বিগ্ন ও বিপন্ন। পক্ষান্তরে ভক্তগণ সব সময় পূত ভগবৎ-কথামৃত আস্বাদনে নিমগ্ন থাকায় তারা সংসার দুঃখ বিস্মৃত হন। এইভাবে সংসারক্লেশ ভোগীর জীবন ও ভগবদ্ভক্তের জীবনে অনেক প্রভেদ রয়েছে ।

কোন বিষয়ীই এই জগতে সগর্বে বলতে পারে না, "আমি দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করি না।" যে কাউকে এই দ্বন্দ্ব পরীক্ষায় আহ্বান করা যায়। প্রত্যেকে এই জগতে কোন রকম দুঃখভোগ করছে, তা না হলে তীব্র মাদক (এল এস ডি) বা এসবের এত বিজ্ঞাপন দেখা যায় কেন? আমেরিকা ও অন্যান্য অগ্রসর পশ্চিমী দেশগুলিতে যন্ত্রণানিরোধক বহু ট্যাবলেট ঔষধ রয়েছে। টেলিভিশনের পর্দায় সবসময় তাদের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। অতএব সেখানে জনগণ এইসব দুঃখ-ক্লেশ ভোগ করছে। বস্তুত ভৌতিক দেহধারী সকলকেই এই দুঃখ ভোগ করতে হবে। এই ভৌতিক জগতে ক্লেশ তিন রকম, এই ত্রিতাপ হচ্ছে— আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক। দৈহিক ও মানসিক ক্লেশের ক্ষেত্রে 'আধ্যাত্মিক' শব্দ উল্লেখ্য। শিরপীড়া, পৃষ্ঠ-বেদনা বা মানসিক অশান্তি হলে তাকে আধ্যাত্মিক ক্লেশ বলে। অন্যবিধ দুঃখও আছে,— কোন জীবদত্ত ক্লেশকে 'আধিভৌতিক' দুঃখ বলে। এ ছাড়া আমাদের নিয়ন্ত্রণের অতীত এক রকম ক্লেশ আছে, তাকে 'আধিদৈবিক' ক্লেশ বলে। এইরকম ক্লেশ বা দুঃখতাপের মধ্যে— দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্লাবন, তাপাধিক্য বা শৈত্যাধিক্য, ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড আদি দেবদত্ত বা প্রকৃতিদত্ত ক্লেশের অন্তর্গত। আবার জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধিরূপ দুঃখ ভোগও আছে, তবু এই মায়িক সংসারে আমরা নিজেদের খুবই সুখী বলে মনে করছি অথচ আমাদের এই মায়িক জীবনে সুখ কোথায় ? কিন্তু মায়াবিষ্ট হওয়ায় আমরা মনে করছি যে আমরা খুবই নিরাপদে আছি। আমরা ভাবছি, "জীবনটা সুখ-ভোগ করা যাক্" কিন্তু এই ভোগের প্রকৃতি কি রকম?

স্পষ্টত আমাদের এই দুঃখ ভোগ সহ্য করতে হবে। সাধুর একটি লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি তিতিক্ষাপরায়ণ বা সহনশীল। প্রত্যেকেই কিছু মাত্রায় সহনশীল, কিন্তু সাধুর সহশীলতা (তিতিক্ষা) আর— সাধারণ মানুষের তিতিক্ষার অনেক প্রভেদ রয়েছে। কারণ সাধুর দেহাত্মবুদ্ধি নেই, তিনি জানেন যে তিনি এই জড় দেহ নন্। এই সম্বন্ধে একজন গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ভজনের একাংশ উল্লেখযোগ্য—

"দেহবুদ্ধি নাহি যার সংসার বন্ধন কাঁহা তার।"

দুঃখকষ্ট উপস্থিত হলেও, আমরা তত্ত্বতঃ যদি উপলব্ধি করি যে স্বরূপতঃ আমরা ক্লেশ অনুভব করব না। যেমন, কেউ যদি মনে করে এই মোটর গাড়ীটা আমার ফলে গাড়ীটিতে সে খুবই আসক্ত হয়, দুর্ঘটনায় গাড়ীটি ভগ্ন বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে যে মনে করে গাড়ীটা মেরামত করা যাবে বা গাড়ীটাকে এখানে রেখে চলে যাওয়া যাক্ তার চেয়ে গাড়ীতে আসক্ত পূর্বতন ব্যক্তি অনেক বেশী ক্লেশ ভোগ করেন। এ সব ব্যাপারটাই মনের আবিষ্টতা— তার উপর নির্ভর করে। কেননা অভক্ত মোটামুটি পশু পর্যায়ভুক্ত, তাই জড়বাদী বিষয়ী বেশী দুঃখভোগ করে। পক্ষান্তরে ভগবদ্ভক্ত ভগবান কৃষ্ণের উপদেশ ভগবদ্গীতা (২/১৪) থেকে গ্রহণ করে—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥

অর্থাৎ, হে কৌন্তেয়, "শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর যথাসময়ে আগমন ও অন্তর্ধানের মত ক্ষণস্থায়ী সুখ আর দুঃখও আমাদের জীবনে গমনাগমন করে; এই সমস্ত অভিজ্ঞতায় বিচলিত না হয়ে তাতে সহনশীল হওয়ার জন্য সচেষ্ট হও।"

গ্রীষ্ম, শীত উভয় ঋতুতেই আমরা ক্লেশ ভোগ করি—

গ্রীষ্মকালে আগুন দুঃখপ্রদ আর শীতকালে সেই আগুনই আবার সুখকর। সেই রকম শীতকালে জল ক্লেশদায়ক কিন্তু গ্রীষ্মকালে সেই জলই আবার আনন্দদায়ক। উভয় ঋতুতেই একই জল ও একই আগুন কখনো সুখকর, আবার কখনো সুখকর নয়। কারণ এই অনুভূতি স্পর্শজাত। আমাদের সকলের দেহ সম্বন্ধীয় এক চর্ম রোগ আছে, সেইজন্য আমরা ক্লেশভোগ করছি। আমরা এত মূর্খে পরিণত হয়েছি যে নিজেদের দেহাত্মবুদ্ধি করছি। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুযায়ী কফ, পিত্ত ও বায়ু- এই তিন উপাদানে আমাদের শরীর সংগঠিত। আমরা যতই দেহাত্মবুদ্ধি করব, আমাদের তাপক্লেশও ততই বৃদ্ধি পাবে। আজকাল এই দেহবুদ্ধি থেকে জাতীয়তাবাদ, সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, সম্প্রদায়তন্ত্রবাদ ও আরও কত মতবাদের বিকাশ হয়েছে। ১৯৪৭ সালে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় জনগণ কত দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে, কারণ প্রত্যেকেই নিজেকে হিন্দু বুদ্ধি বা মুসলমান বুদ্ধি করেছিল। কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় উন্নত ভক্ত ঐ রকম ভ্রান্ত বুদ্ধিতে আবিষ্ট হয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা করে না। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ব্যক্তির এই জ্ঞান হয়েছে যে তিনি হিন্দু বা মুসলমান কিছুই নন, কৃষ্ণের নিত্যদাস। জনগণ নিজেদের দেহাভিমান শিক্ষা করার ফলে দিনদিন তাদের দুঃখ-ক্লেশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করছে। আমাদের এই দেহাভিমান হ্রাস করলে, দুঃখ-কষ্টের অনেক লাঘব হবে। যারা কৃষ্ণভাবনাময়, যারা নিরন্তর মনপ্রাণ দিয়ে কৃষ্ণভক্তি রস আস্বাদন করে, তারা জীবনে বিশেষ ক্লেশ অনুভব করেন না, কারণ তারা জানেন কৃষ্ণের ইচ্ছায় তারা সেই ক্ষীণ ক্লেশ ভোগ করে। তাই, কৃষ্ণের ইচ্ছা হলে, তারা বরং দুঃখ-তাপকে তাদের জীবনে আমন্ত্রণ জানান। যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অবসানে, হস্তিনাপুর ত্যাগ করে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাভিমুখী হলে রাজমাতা কুন্তিদেবী প্রার্থনা করেছিলেন, "হে কৃষ্ণ, যখন আমরা চরম বিপদে পতিত হয়েছিলাম, তখন তুমি কৃপাপরবশ হয়ে সবসময়ই অকৃত্রিম সুহৃদ ও উপদেষ্টা রূপে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলে। রাজ্য লাভ করে আমরা এখন নিরাপদে আছি, কিন্তু তুমি এখন আমাদের পরিত্যাগ করে দ্বারকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করছ, এই ঘটনা আমাদের পক্ষে আদৌ কল্যাণপ্রদ নয়। যদি এখন আমরা আবার বিপন্ন হই, তাহলে তোমাকে একান্ত মনে স্মরণ করব, তা বরং অনেক মঙ্গলজনক।" এইভাবে নিরন্তর কৃষ্ণ স্মরণে সুযোগ লাভের জন্য ভগবদ্ভক্ত কখনও কখনও দুখতাপকে আমন্ত্রণ জানায়। ক্লেশ ভোগের সময় ভক্ত মনে মনে ভাবে "এই সব দুঃখ-তাপ আমার পূর্ব কর্ম ফল। কৃষ্ণ-কৃপায় ফলে আমি অতি সামান্য দুঃখই ভোগ করছি, বস্তুতঃ আমার অনেক ক্লেশ-ভোগ করা উচিত। যাইহোক্ এই সুখ-দুঃখ ভোগ, সবই মানবিক অনুভূতি মাত্র। এইভাবে ভগবদ্ভক্ত দুঃখ-তাপে খুব বেশী প্রভাবিত হন না। এইখানেই একজন হরিভক্ত ও অভক্তের মধ্যে পার্থক্য।

(৭পৃষ্ঠার পর)

তদুপরি চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে সমর্থ হয়। আমাদের দেহে যে মেরুদন্ড আছে তাহা শরীরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিতি -হেতু উক্ত মেরুদন্ড সরলভাবে রাখিলে উৎসর্গদ্বার হইতে মস্তক পর্যন্ত মেরুদন্ডের মধ্যবর্ত্তিস্থানের ছিদ্রপথে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ রেখা পতিত হয় । যোগাভ্যাস -প্রক্রিয়ায় মেরুদন্ড এইরূপ সরল রাখিবার প্রথা আছে।

এখন অণু কি, তাহা দেখা যাউক। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, একটি অণু একটি ধন ও আটটি ঋণ তড়িৎদ্বারা গঠিত। প্রত্যেক অণুতে আটটি ঋণ ও একটি ধন তড়িৎকণ প্রকৃতি-পুরুষের ন্যায় বাস করে। দেখা গিয়াছে যে, একটি সজাতীয় তড়িৎ পরস্পর পরস্পকে বিকর্ষণ ও একটি বিজাতীয় তড়িত পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই বিজাতীয় তড়িত উভয়ের আকর্ষণের ফলে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া যে দানায় বা অণুতে পরিণত হয়, তাহাতে কিঞ্চিৎ আকর্ষণ শক্তি থাকিয়া যায়। ইহা হইতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তির উদ্ভব। কিন্তু প্রত্যেক সজাতীয় তরিৎকণ যখন অণু হইতে বিভক্ত হইয়া আলাদা অবস্থায় থাকে, তখন তাহার প্রত্যেকে, একটি অণুর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অপেক্ষা, বহুগুণ অধিক। মনে করুন, আপনি একখন্ড প্রস্তর লইয়া আর একখন্ড প্রস্তরে আঘাত করিতে লাগিলেন। আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া মিলাইয়া যাইতে লাগিল। এরূপ করিতে করিতে সমস্ত প্রস্তর নিঃশেষ হইয়া গেল। আপনি কি বুঝিলেন? বুঝিলেন, - ঐ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ,সংঘর্ষে উত্তেজিত প্রস্তরের প্রত্যেক অণুর ভিন্ন জাতীয় এবং তড়িৎকণ সুপ্তাবস্থা হইতে বিভক্ত হইয়া পুনরায় শূণ্যে নিজ নিজ স্বভাবদ্বারা সংযুক্ত হইয়া অণুরূপ ধারণ করিয়া শূণ্যে বিলিন হইতেছে। ঐ সমস্ত বিক্ষিপ্ত অণু যদি পুণঃ সংযুক্ত হয়, তবে যে প্রস্তর সংঘর্ষণ দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাই পুণঃ গঠিত হইবে। অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম শ্রীনাম এ সকল প্রাকৃত-বিজ্ঞান-বিচার হইতে বহু উর্দ্ধে অবস্থিত- ইহা উপলব্ধির বিষয় হইলেই জীব কৃতকৃত্য হয়। আসুন, সুধী পাঠক-পাঠিকাবর্গ, যিনি কৃষ্ণকীর্তন-সুরধনীর অমলধারা প্রপঞ্চে প্রকটিত করাইয়া গৌরকীর্তন-রসহীন মরুজগৎকে অনুক্ষণ সুশীতল করিতে সদাই ব্যস্ত, যিনি স্বয়ং অধোক্ষজের সেবা-অনুষ্ঠান করিয়া সৌভাগ্যবান জীববৃন্দকে অধোক্ষজের-সেবারস পান করাইবার মূল উৎসস্বরূপ, সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমলে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া আমরা অনুক্ষণ গৌরবিহিত কীর্তন গান করিয়া জন্ম ও জীবন সার্থক করি।

কীর্তনে বিজ্ঞান

- ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

ভগবান কি এবং কিরূপেই বা তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাহা জানিবার জন্য স্বভাবতঃ মনুষ্য-হৃদয় সমুৎসুক। শাস্ত্রকারগণ ধ্যান, ধারণা, নাম-সংকীর্তনাদি ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কোন পন্থা মনুষ্য-হৃদয়ের জন্য সহজ-বোধগম্য, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। ভগবান অসীম। অসীমের পূর্ণতা ধারণা করা সসীম মনুষ্যের সীমাবদ্ধ চিন্তাশক্তির দ্বারা সম্ভব নহে। উক্ত চিন্তাশক্তি দ্বারা অনন্তের চিন্তা করিতে গিয়া আমারা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তাহা দেখা যাউক।

দেখা যায়, কোনও বিষয় চিন্তা করিতে হইলে মনের একাগ্রতা বিশেষ আবশ্যক; কারন, মন সর্বদা বিক্ষিপ্ত। এক বস্তুর চিন্তায় মনকে অধিকক্ষণ স্থির রাখা সাধারণতঃ অসম্ভব। নির্জনে আহ্নিক করিতে বসিলাম, কিন্তু কোথায় আহ্নিক। সাংসারিক যাবতীয় বিষয় ক্ষণে ক্ষণে মনে উদিত হইয়া ক্ষণে লয় হইতে লাগিল। অলী যেমন পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে মধু আশে ধাবিত হয়, মনও তদ্রুপ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যাইতে লাগিল, কিছুতেই বশে আনিতে পারিলাম না। আমার আহ্নিক হইল না। বিক্ষিপ্ত মন বশে না আসিলে - একাগ্র না হইলে চিন্তিত বিষয় কিরূপে ধারণযোগ্য হইতে পারে ? বিক্ষিপ্ত মন সংযত করিয়া চিন্তিত বিষয়ে একাগ্রভাবে নিয়োজিত করিলে চিন্তিত বিষয় বোধগম্য হওয়া সম্ভবপর। পাঠাভ্যাসরত বালক পাঠাভ্যাসকালীন যদি ক্রীড়া-কৌতুকাদি চিন্তা করিতে থাকে, তবে কি তাহার পাঠাভ্যাস হয় ?

ভগবদ' -বিষয়ক বিরাট ব্যাপার চিন্তা করিতে হইলে কিরূপ একাগ্রচিত্ত হওয়া প্রয়োজন, তাহা অনুমেয়। শব্দময় সংকীর্তনাদির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার পূর্ব্বে চিন্তাময়, জ্ঞানময় যোগের বিষয় আলোচনা করা যাউক। যোগ বা চিত্তবৃত্তি-নিরোধ দ্বারা মনঃসংযোগ করিয়া ভগবানকে চিন্তা করিবার প্রথা আছে। মন কেনইবা সদা বিক্ষিপ্ত ও যোগাভ্যাসদ্বারা মনস্থির কিরূপ সম্ভবপর, তাহার বিজ্ঞানসম্মত কি কারণ থাকিতে পারে, তাহা অগ্রে দেখা যাউক; পরে নামসংকীর্ত্তনাদিদ্বারা মনস্থির অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য কিনা, সে বিচারভার ভক্ত-পাঠকবর্গের উপর ন্যস্ত করা যাইবে। অন্ধকার যেমন আলোকের সৌন্দর্য-বৃদ্ধিকর , কৃষ্ণবস্তু যেমন শ্বেতবস্তুর উৎকর্ষসাধক, নিকৃষ্ট যেমন উৎকর্ষ বস্তুর ধারণোদ্দীপক, শব্দময় নামসংকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে যোগ বা প্রাণায়াম কি, তাহা অগ্রে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।
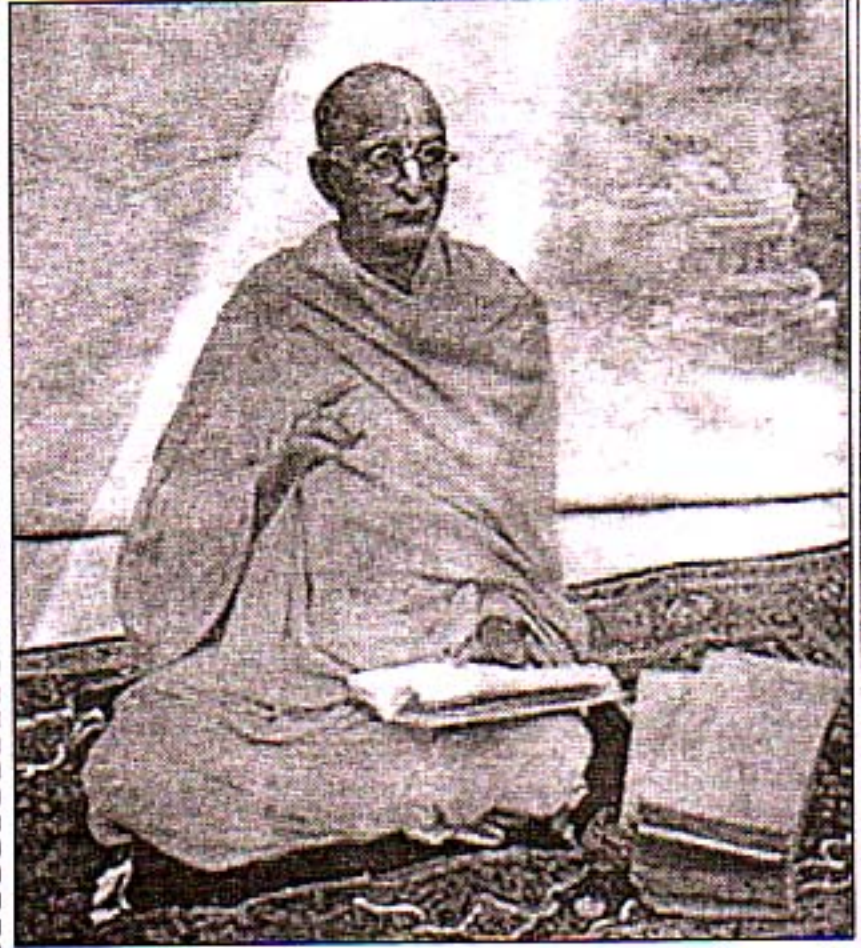
জাগতিক সমস্ত সৃষ্ট বস্তু অণু -পরামাণুদ্বারা গঠিত। এই অণু-পরমাণু সর্বদা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে। এই কারণে স্বল্পপরমাণুগঠিত জগৎ বহু-পরমাণুগঠিত সূর্য্যদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহারই চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমাণ আছে। আমাদের এই অণু-পরমাণুগঠিত দেহও পৃথিবীদ্বারা সদা আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে সংলগ্ন আছে। তাহাকেই দেহের গুরুত্ব কহে। স্বল্পপরমাণুগঠিত ক্ষীণকায় ব্যক্তি অধিক পরমাণুগঠিত স্থূলকায় ব্যক্তি অপেক্ষা লঘু, কারণ স্থূলকায় ব্যক্তির অধিক পরামাণু পৃথিবী-কর্ত্তৃক অধিক আকৃষ্ট হইতেছে, বিজ্ঞানবিদ্‌মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ একটি আনুমানিক সরলরেখার উপর অবস্থিত। যদ্যপি একটি দন্ড ঠিক মধ্যস্থলে উপরিভাগ হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত, আনুমানিক সরল রেখাবিশিষ্ট একটি ছিদ্র করা যায় ও সেই দন্ডটি পৃথিবীর উপর এরূপভাবে রাখা যায় যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষক রেখা দন্ডের মধ্যবর্ত্তী আনুমানিক ছিদ্রপথের ভিতর পড়ে, তবে উক্ত দন্ডটি পৃথিবীর উপর দন্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হয়। দন্ডের বক্রতা ঘটিলে উক্ত দন্ড আর যথাস্থানে থাকিতে পারে না। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ দন্ডের একবিন্দু হইতে বিন্দন্তরে গমন বিধায় দন্ডের চঞ্চলতা-হেতু পতন অবশ্যম্ভাবী। বাজীকরগণ এই প্রক্রিয়ায় নিজদেহ শূণ্যস্থিত তারের উপর ঠিক রাখিয়া

বাকী অংশ ৬পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

শ্রীকৃষ্ণ বলরামের শৈশব লীলা

– শ্রীমৎ সুভগ স্বামী মহারাজ

আজ থেকে ৫০০০ বছর আগের কথা। মনুষ্যরূপে শ্রীভগবান স্বয়ং মথুরায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবদ্গীতায় ভগবান স্বয়ং বলেছেন, তার আর্বিভাবের কারণ : তা হচ্ছে-

পরিত্রাণায় সাধূণাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম সংস্থাপণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।।

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তদের রক্ষা ও অসুর হনন করে, ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে তিনি আবির্ভূত হন। তবে বৈষ্ণবাচার্যরা বলেন, বিশেষভাবে ভক্তদের আনন্দ দানের জন্যই তাঁর আবির্ভাব এবং তাঁর বিভিন্ন মধুর ও অদ্ভুত সব লীলা প্রদর্শন। ভক্ত, ভগবান ও ভগবদ্ভক্ত বা ভগবৎ-সেবা এই তিনিটি নিত্য।

ভগবানের এই সব অপ্রাকৃত, দিব্য লীলা বিলাসের শেষ নেই। কোন ভগবদ্ভক্ত এই সম্বন্ধে বলেছেন-

শ্রুতিম্ অপরে স্মৃতিম্ ইতরে
ভারতম্ অন্যে ভজন্তৌ ভবভীতাঃ।
অহম্ ইহ নন্দং বন্দে
যষ্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥

অর্থাৎ "ভবসংসারের ভয়ে ভীত অন্যেরা শ্রুতি-স্মৃতি অর্থাৎ বেদ ও বৈদিক শাস্ত্র, পুরাণ মহাভারতাদির উপাসনা করুক, আমি কিন্তু যার গৃহাঙ্গনে শিশুরূপে পরমব্রহ্ম হামাগুড়ি দিয়ে খেলা করেন, সেই নন্দ মহারাজের উপাসনা করব।" এই সব দিব্য, অপ্রাকৃত মধুর ভগবৎ-লীলা সমূহ স্মরণ করে ভগবদ্ভক্তবৃন্দ সর্বদাই অপার আনন্দ অনুভব করেন। ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্তরা দিব্য কৃষ্ণলীলাবিলাসসমূহ শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণাদিতে নিমগ্ন থেকে অশেষ আনন্দ লাভ করেন। নারদমুনি তাই ব্যাসদেবেকে ভগবানের লীলাবিলাসের মহিমা কীর্তন করতে বলেছিলেন। ব্যাসদেব বেদসমূহ প্রণয়ন করে আনন্দ লাভ করতে পারেন নি, তৃপ্তি লাভ কতে পারেননি, তার কারণ তিনি ভগবানের গুণ-কীর্তন করেননি। তখন নারদমুনি তার নিরানন্দের কারণ, তাঁর বিষ্ময়ভাবের কারণ তাঁকে ব্যাখ্যা করেন ও ভগবানের শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস কীর্তন করতে বলেন। শ্রী ব্যাসদেব তখন শ্রীমদ্ভাগবতের মাধ্যমে 'হরি কীর্তন' করেন। ভগবান কৃষ্ণও স্বয়ং তাঁর ভক্তের লক্ষণ এভাবে প্রকাশ করেছেন-

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্ ।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥

একদিন বসুদেব কুল পুরোহিত গর্গমুনিকে নন্দ-যশোদার গৃহে পাঠান। নন্দ-যশোদা গর্গমুনিকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। নন্দ মহারাজ তাঁর গৃহে শিশু দুটির সম্বন্ধে বিশদ জানতে চান ও তাদের নামকরণ করতে মুনিকে অনুরোধ করেন। প্রথম শিশুটি অসাধারণ বলবান হওয়ায় তার নাম হল বলদেব। এই রোহিনীপুত্র সকলকে দিব্য আনন্দ দান করায় তার নাম হল রাম। যদু বংশ ও নন্দবংশকে মিলিত করবার জন্যে এই শিশুর অন্য এক নাম হল সঙ্কর্ষণ।

অন্য পুত্রটি সম্বন্ধে গর্গমুনি বললেন যে সে বিভিন্ন যুগে শুক্ল, রক্ত ও পীত বর্ণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এইবার সে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এসেছে। বসুদেবের পুত্ররূপে সে জন্মগ্রহণ করেছিল, তাই তাঁর এক নাম হচ্ছে বাসুদেব। তাঁর নাম, যশ, ঐশ্বর্য আদি ঠিক ভগবান নারায়ণের মত। কংস যাতে জানতে না পারে যে কৃষ্ণ এখানে আছে, তাই এই নামকরণ উৎসব অনাড়ম্বরভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

কৃষ্ণ-বলরাম ব্রজভূমিতে হামাগুড়ি দিয়ে খেলা করতো। গোপ-গোপীরা তাদের শৈশব-লীলা দর্শন করত। তাদের পায়ে নূপুর ধ্বনি শুনে শিশুরা আকৃষ্ট হোত। কৃষ্ণ-বলরাম তখন ব্রজবাসীদের অনুসরণ করতো। যখন তাঁরা বুঝতে পারতো যে এরা তাঁদের মা নয়, তখন সন্ত্রস্ত হয়ে মা যশোদা ও রোহিনীর কাছে ফিরে চলে যেতো। তাদের হামাগুড়ি দেখে প্রতিবেশীরা মুগ্ধ হয়ে বলতো, 'দেখ, কৃষ্ণ

বলরাম কেমন হামাগুড়ি দিয়ে খেলছে।" কাঁদা-গোয়ম ধূলাতে আচ্ছন্ন দুষ্ট শিশু কৃষ্ণ-বলরামকে খুব সুন্দর দেখাতো, মা যশোদা ও রোহিনী সস্নেহে তাদের নিজ নিজ সন্তাদের কোলে তুলে নিয়ে স্তনদান করাতেন। যোগমায়ার প্রভাবে স্নেহময়ী যশোদা ও রোহিনীদেবীভাবতেন, এই আমার পুত্র, আর শিশুরা মনে মনে চিন্তা করতো, এই আমার স্নেহময়ী মা। মাতৃস্তন্য পান করে কৃষ্ণ ও বলরামকে খুব খুশি দেখাতো। মা যশোদা ও রোহিনী তাঁদের শিশুদের হাসিখুশি মুখ দেখে পরম আনন্দ লাভ করতেন। তাদের মুখের ভেতর শুভ্র সদ্যোজাত ছোট ছোট দাঁতগুলো গুণে আহ্লাদিত হয়ে উঠতেন মা যশোদা ও রোহিনী। যখন গৃহস্থলীর কাজে গোপীরা নিযুক্ত থাকতো তখন কৃষ্ণ-বলরাম স্বাভাবিক শিশুসুলভ ঔৎসুক্যবশত গোবৎসদের পুচ্ছ আকর্ষণ করতো। গোবৎসরা তখন ভীত হয়ে চারিদিকে ছুটাছুটি করতো। ব্রজ গোপীরা কৃষ্ণ-বলরাম ও গোবৎসদের এই রকম ক্রীড়া দেখে খুব আনন্দ উপভোগ করতো। বিভিন্ন পশু পাখি, বানরাদি দ্বারা কৃষ্ণ-বলরাম শিশু দুটির বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনায় স্নেহময়ী মা যশোদা রোহিনী সর্বদাই উদ্বিগ্ন থাকতেন। ভগবদ্গীতায় লীলা পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং বলেছেন যে তাঁর এইসব লীলা বিলাস সমূহ সবই অপ্রাকৃত।

গোপীরা নিযুক্ত থাকতো তখন কৃষ্ণ-বলরাম স্বাভাবিক শিশুসুলভ ঔৎসুক্যবশত গোবৎসদের পুচ্ছ আকর্ষণ করতো। গোবৎসরা তখন ভীত হয়ে চারদিক ছুটাছুটি করতো। ব্রজ গোপীরা কৃষ্ণ-বলরাম ও গোবৎসদের এই রকম ক্রীড়া দেখে খুব আনন্দ উপভোগ করতো। বিভিন্ন যে তাঁর এইসব লীলা বিলাস সমূহ সবই অপ্রাকৃত।

'জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্'। জড় জগতের উদ্বেগাদি সকল মনোভাবই বৈকুণ্ঠ জগতে বস্তুত রয়েছে। কিন্তু জড় জগতের এই সব মানসিক ভাবগুলি সবই প্রাকৃত। বৈষ্ণবাচার্যদের মতে মা যশোদা ও রোহিনী পুত্রদের লীলাবিলাস দর্শনের আনন্দ জড় জাগতিক নয়। শাস্ত্রে এই অনুভূতিকে চিন্ময় রস বলে অভিহিত করা হয়েছে। গোপীরা কৃষ্ণ লীলা উপভোগ করবার জন্য মা যশোদার কাছে গিয়ে দুরন্ত শিশু কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করত। কৃষ্ণ যখন মায়ের কাছে উপস্থিত থাকতো, তখন প্রতিবেশিনী ব্রজ গোপিকারা এসে দুষ্ট কৃষ্ণর দুস্কর্মের কথা বলতো, "প্রিয় যশোদা তুমি কৃষ্ণকে শাসন করবে।" "কৃষ্ণ-বলরামের দুষ্টমির কথা শোনঃ প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় দু'ভাই আমাদের গৃহে আসে, গো দহনের আগেই তারা গোবৎসদের বন্ধন খুলে দেয়। তার ফলে গোবৎসরা
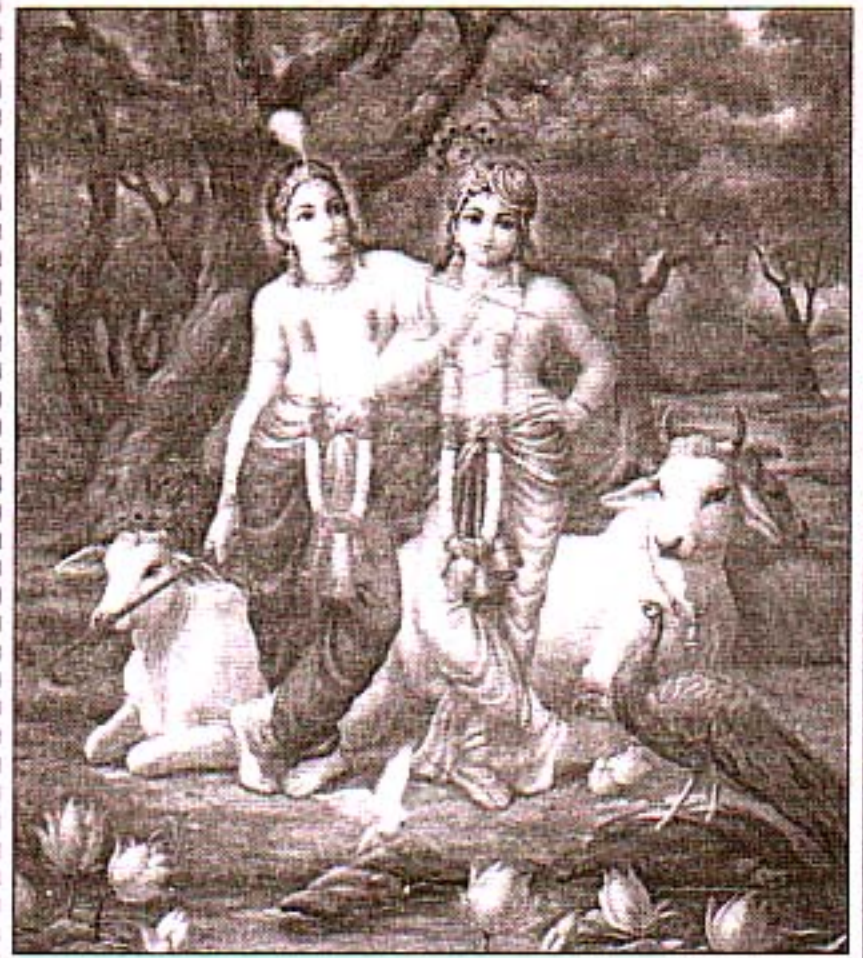
গরুর সব দুধই পান করে ফেলে। তাই গো-দোহন করতে গিয়ে আমরা শূন্য পাত্রে ফিরে আসি। এখন এ ব্যাপারে তাদের সতর্ক করে দিলে, তারা শুধু মিষ্টি হাসি হাসে তাই কিছুই করা যায় না। তাছাড়াও আমাদের অনুপস্থিতিতে গৃহের সমস্ত দই, মাখন, ছানাদি দ্রব্য চুরি করে তাঁরা খুব আনন্দ লাভ করে। আবার ধরা পড়ে গেলে তারা বলে, আমাদের ঘরে কি দই, ছানা, মাখনের অভাব আছে মনে কর? কখনো কখনো বানরদের মধ্যে এইসব ছানা, মাখন, দই তাঁরা বিতরণ করে দেয়। বানররা মাখন, ছানা খেয়ে তৃপ্ত হলে আর নেয় না, তখন কৃষ্ণ-বলরাম বলে, দেখ এই সব মাখন দই কোন কাজেরই নয়। বানর পর্যন্ত তা খাচ্ছে না।"এই বলে তাঁরা শিকায় ঝুলানো দই-মাখনের পাত্রগুলোকে ভেঙ্গে ফেলে, চারিদিকে তা ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে নষ্ট করে। আমরা যখন এইসব মাখন, দই গৃহের কোথাও লুকিয়ে রাখি, যদি তাঁরা খুঁজে না পায়, তখন কৃষ্ণ-বলরাম আমাদের ঘুমন্ত ছোট্ট শিশুদের চিমটি কেটে কাঁদায়। তারপর ঘর থেকে পালিয়ে যায়। আমরা গৃহের কোন উঁচু জায়গায় এইসব মাখন, ছানার পাত্রগুলি এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখি, যাতে তারা কেউ এগুলো ধরতে না পারে। কিন্তু তারা ঘরের কাঠের উদূখলগুলো একসঙ্গে জড়ো করে তার ওপরে দাঁড়িয়ে ঐসব মাখন ছানা সংগ্রহ করে। ঘর অন্ধকার হলেও তাদের দেহের অলঙ্কারে বিচ্ছুরিত আলোতে তারা সব কিছু খুঁজে বের করে ফেলে, তাই আমরা মনে করি, ওদের দেহের অলঙ্কারগুলো যদি তোমরা খুলে নাও, তা হলে ভাল হয়।"মা যশোদা রাজি

হয়ে বলেন, 'আচ্ছা তাই হবে আমি কৃষ্ণের দেহ থেকে গহনাগুলো খুলে নেব। তাহলে ওরা আর মাখনের পাত্রগুলো ঘরের অন্ধকারে খুঁজে পাবে না।" তারপর তারা বলল, "কৃষ্ণ-বলরামের দেহ থেকে এক রকম আলো বিচ্ছুরিত হয়, তার ফলে অন্ধকারেও তাঁরা সব কিছুই দেখতে পারে, তাই তাঁদের দেহের অলঙ্কারগুলো খুলে নিও না।" জড় জাগতিক বিচারে চুরি করা নিন্দনীয়, কিন্তু ভগবান সর্বদাই পবিত্র। ভগদ্গীতায় বলা হয়েছে 'পবিত্রম্ পরমম্'। তিনি পূর্ণতত্ত্ব। তিনি পরম সত্য, তাঁর কাজে কোন হেয়তা নেই। জগতে নৈতিক বিচারে চুরি করা গর্হিত হলেও কৃষ্ণ ও তাঁর লীলাবিলাস-সমূহ সবই জীবকুলের মন হরণ করে। সর্বাকর্ষক হওয়ায় তাঁর নাম কৃষ্ণ। এই রকম দিব্য প্রীতিময় স্তরেই ভগবৎ-সেবা অনুষ্ঠিত হয়, আর তা মা যশোদা রোহিনী ও ব্রজগোপিকাদের চিত্তহরণ করে, তাই কৃষ্ণকে তাঁর এইসব কাজের জন্য তিরস্কার বা ভৎসনা করতে পারেন না। পক্ষান্তরে তারা এই সব কাজ দেখে হাসেন। এইসব কৃষ্ণলীলা-কথা বলে ও শুনে দিব্য আনন্দ লাভ করেন। একদিন কৃষ্ণ, বলরাম ও অন্যান্য ব্রজের গোপবালকরা যখন খেলাধুলা করছিল, তখন তাদের কাছে মা যশোদা শুনলেন যে কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে। বলরামসহ কৃষ্ণের অন্যান্য সখাদের কাছে এই কথা শুনে তাঁর পরম হিতাকাঙ্খী ও কল্যাণকামী মা যশোদা কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন সে মাটি খেয়েছে কিনা? বড় ভাই বলরাম ও তাঁর অন্যান্য সখারা এই অভিযোগ তাঁর সম্বন্ধে করছে বলে মা কৃষ্ণকে জানালেন। নন্দ-যশোদার গৃহে মাখন, আদি খাবারে সর্বদাই পরিপূর্ণ থাকতো। খাবারের কোন অভাবই ছিল না কখনও। তাহলে কৃষ্ণ মাটি খেল কেন? এটি হচ্ছে কৃষ্ণের অপ্রাকৃত দিব্য লীলা বিলাস-সমূহের আর একটি, গোপীদের দিব্য আনন্দ দানের জন্য এই সব লীলা অনুষ্ঠিত হত।

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

আলোচনা করতে গিয়ে আরও একটা বিষয় মনে পড়ে। তা হলো নাম যজ্ঞের অপ-সংস্কৃতির দৌরাত্ম্য। এ দেশে অনেক স্থানে কীর্তনীয়াগণ নাম যজ্ঞকে যাত্রা গানের আসরে রূপান্তরিত করেছেন। যজ্ঞবৈ বিষ্ণু, যেখানে বিষ্ণু অবস্থান করে সেখানে লীলা অভিনয়, নরনারীর অবাধ নৃত্য, আলিঙ্গণ নারী কীর্তনীয়া দল কর্তৃক পেশাগত কীর্তন পরিবেশন ইত্যাদি অশোভনীয় মহড়া ছাড়া আর কিছুই ঘটেনা। তা ছাড়া অনেক কীর্তনীয়া দল মাছ, মাংস, পেঁয়াজ, রসুন খেয়ে এবং বিড়ি, সিগারেট, পান, সুপারি, জর্দ্দা, গুল, ভাঙ্গ, গাঁজা, সেবন করে নামকীর্তন পরিবেশন করে। এছাড়া নিদিষ্ট মহামন্ত্রকে বাদ দিয়ে যে সম্প্রদায় যে মন্ত্র কীর্তন করতে বলেন পেশাদারী কীর্তনীয়ারা সেই মন্ত্র কীর্তন করে থাকে। এগুলি অবশ্যই বর্জনীয়। সকল সম্প্রদায়ের মহামন্ত্র একটাই তা হলো-

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

অনেক স্থানে দেখা যায় নামের সুরের চেয়ে বাদ্যযন্ত্রের গর্জনে শ্রীনামের মধুময় কথা শুনাই দুষ্কর হয়ে ওঠে। নাম কীর্তন সাধারণত সময় উপযোগী রাগের উপর গাওয়া উচিত, কিন্তু তা না করে বিভিন্ন জড়-জাগতিক ছায়াছবির গানের সুরের উপর ভিত্তি করে নাম কীর্তন পরিবেশন করা হয়, যার ফলে আসল উদ্দেশ্য ব্যহত হচ্ছে।

এমনকি নামী-দামী কীর্তনীয়া সম্প্রদায় নাম কীর্তনের সাথে 'রাসলীলা' অভিনয় পরিবেশন করে থাকেন, কীর্তনীয়া দলের মধ্যে একজন কৃষ্ণ ও অন্য জন রাধা সাঁজে, এবং দলের অন্য সকলে গোপী সাজে সজ্জিত হয়। পারমার্থিক জগতে যাদের জন্ম হয়নি সেই সব সাধারণ মানুষের কাছে অপ্রাকৃত লীলা রহস্য উপস্থাপন করে থাকে। ভগবানের নাম, রূপ, গুন, পরিকর, ব্রজলীলা ঘটনা সবই অপ্রাকৃত।

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।

এগুলি সাধারণ মানুষের বুদ্ধি ও মানসিকতায় ধরা পড়বেনা, অপ্রাকৃত বস্তুকে সাধারণ লৌকিক ভাষায় কিংবা অভিনয়ে প্রকাশ ও প্রচার দুঃসাধ্য। অসাধারণ অনুভূতিময় এবং পরমভাবযুক্ত বিষয়বস্তু সমূহ সাধারণ লৌকিক অভিনয়ে প্রকাশ করলে তা হেঁয়ালী হয়ে দাঁড়ায়, অপপ্রচার হয়। সাধারণ অজ্ঞ মানুষের নিকট অপসংস্কৃতি অপযশ কীর্তিত হয়। তাই নামযজ্ঞ সমূহে তার যথার্থ শ্রদ্ধাভক্তি ও ভাব গাম্ভীর্য বজায় রাখার জন্য যত্নশীল হওয়া সকলেরই কর্তব্য।

উপরোক্ত আলোচনার বিষয়বস্তু (সুধী পাঠক-পাঠিকা) আপনাদের জীবনে বিন্দুমাত্র উপকারে আসলে সেটা গুরুগৌরাঙ্গ কৃপা আশির্বাদ স্বরূপ বলেই জানবেন। আর যদি আপনাদের হৃদয়ে কলুষতা বিন্দুমাত্র প্রকাশ পায় তা হলে এই অধমের অজ্ঞানতারই বহিঃ প্রকাশ বলে মনে করবেন। **হরেকৃষ্ণ!**

সম্মানিত সকল এজেন্টদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, পত্রিকা প্রচারের সুবিধার্থে আপনাদের নিজ নিজ মোবাইল নম্বর আমাদেরকে (ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে) অবহিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
-সম্পাদক

শ্রীকৃষ্ণের জন্য সময়

আমাদের সময়ের আমাদের জীবনের সদ্ব্যহারে আমাদের উচিত পরম কারণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাধান্য দেওয়া।

-শ্রীমদ্ গিরিরাজ স্বামী মহারাজ

সময় .... "আমি লোকরক্ষাকারী প্রবৃদ্ধ কাল। এখন লোক সংহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছি", শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন। (ভগবদ্গীতা ১১/৩২)। শক্তিশালী সময় হল পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতিনিধি। সময়ের মাধ্যমে ভগবানের ইচ্ছা প্রকাশ হয়।

আমাদের সকলের কাছে সময় জিনিসটি অত্যন্ত জরুরি, কারণ আমাদের জীবনের মেয়াদ সময় দিয়ে তৈরি। কিভাবে আমরা সময় ব্যবহার করছি, সেটাই হিসাব দেবে কিভাবে আমরা আমাদের জীবনকে ব্যবহার করছি।

একবার বোম্বেতে এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের সাথে আলোচনা করতে করতে শ্রীল প্রভুপাদ চাণক্য পণ্ডিতের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছিলেন : "মৃত্যুর সময়ে দুনিয়ার সমস্ত ঐশ্বর্য-সম্পদের বিনিময়েও এক মুহূর্ত সময় কেউ কিনতে পারে না।" সময় হল অমূল্য এবং তার বিনিয়োগ অতি সাবধানতার সাথে করতে হবে। "সুতরাং প্রত্যেক মুহূর্তকে সর্বোচ্চ লাভের কাজেই নিয়োগ করতে হবে, "শ্রীল প্রভুপাদ বলে চললেন। "তোমার জীবনের হিসাবের-খাতায়, কৃষ্ণভাবনাময় কাজে ব্যবহার করা প্রতিটি মুহূর্ত হল লভ্যাংশ, এবং জড়জাগতিক কাজে নিয়োজিত সব সময় পড়ে লোকসানের অংশে। জীবনে আমরা যদি সর্বোচ্চ লাভটাই পেতে চাই, আমাদের প্রত্যেক মুহূর্তকে কৃষ্ণভাবনায় ব্যয় করতে হবে।"

সর্বোচ্চ লাভটি কি? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "যং লব্ধ চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ' "কেউ যখন প্রকৃতই কৃষ্ণভাবনার এই স্তরে অবিচলিতভাবে অবস্থিত হন, তখন আর অন্য কোনও কিছু লাভই এর থেকে অধিক বলে মনে হয় না।" (ভগবদ্গীতা ৬/২২)

আমাদের সময়ের-আমাদের জীবনের-ব্যবহারে আমাদের উচিত পরম কারণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রথম প্রাধান্য দেওয়া। "যে সমস্ত বিষয়ের প্রাধান্য বেশি, তারা কখনই স্বল্প প্রাধান্যের বিষয়ের দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রত্যাশায় পড়ে থাকবে না।"–গ্যেটে (জার্মান কবি–সাহিত্যিক)

কৃষ্ণভাবনার চেয়েও দরকারি আর কি জিনিস আছে? আমরা পুনঃ পুনঃ জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির দ্বারা ক্লেশ ভোগ করে চলেছি। কত শত জন্ম পরে আমরা দুর্লভ মনুষ্য জন্মে পেয়েছি যা হল এই জড় অস্তিত্বের দুঃখময় কবল থেকে আমাদের মুক্ত করার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।

মনুষ্যজাতির বুদ্ধি বিশেষতই ভগবানকে উপলব্ধি করার জন্য এবং জীবনের সমস্যাদির একটি স্থায়ী সমাধানে পৌঁছবার জন্য। এই সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদটি সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনায় ব্যবহার করতে যে ব্যর্থ হয়, সে হল সব চেয়ে কৃপণ এবং নির্বোধ।

আমরা যখন সারাদিনের, সারা সপ্তাহের, সারা জীবনের কাজের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করি, তখন আমাদের উচিত সবচেয়ে জরুরি কাজগুলোর জন্য সর্বাগ্রে সময় নির্দিষ্ট করে রাখা শুদ্ধ ভক্তসঙ্গে ভগবদ্ধামের সমাচার আলোচনা ও সম্প্রচার করার সময়টুকু। "সূর্যদেব প্রতিদিন উদিত ও অস্তগত হয়ে সকলের আয়ু হরণ করেন, কিন্তু যাঁরা সর্বমঙ্গলময় পরমেশ্বর ভগবানের কথা আলোচনা করে তাঁদের সময়ের সদ্ব্যবহার করেন, তাঁদেরই আয়ু কেবল তিনি হরণ করেন না।" (শ্রীমদ্ভাগবত ২/৩/১৭)। আমরা যদি সব চেয়ে জরুরি কাজগুলোর জন্য সবার আগে সময় আলাদা করে রাখি, তা হলে কম জরুরি ব্যাপারগুলোকে আমরা সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে পারব।

একজন শিক্ষক একঘর ছাত্রের সামনে নিয়ে এলেন এক বিশাল মুখ-খোলা কাচের বয়াম। তিনি পাথরের টুকরো দিয়ে বয়ামটি ভরে ফেললেন এবং ছাত্রদের

জিজ্ঞাসা করলেন, "বয়ামটি কি ভর্তি?"

ছাত্ররা উত্তর দিল, "হ্যাঁ।" শিক্ষক তখন বয়েমের মধ্যে নুড়ি পাথর ফেলে বড় পাথরগুলোর মাঝে ফাঁকগুলো ভরে দিলেন। আবার জিজ্ঞেস করলেন, "এবার বয়ামটি কি ভর্তি?"

এতক্ষণে ছাত্ররা একটু জ্ঞান বাড়িয়ে ফেলেছিল, তারা চুপ করে রইল।

শিক্ষক মহাশয় তখন নুড়ি পাথরের ফাঁকে ফাঁকে বালি ঢেলে দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "এবার কি বয়ামটি ভর্তি?"

এবারও ছাত্ররা চুপ করে রইল। এবার শিক্ষক জল ঢেলে কানা পর্যন্ত ভর্তি করে দিলেন। এখন বয়ামটি ভর্তি হল।

এর থেকে আমরা কি শিখি? প্রথমে আমরা যখন পাথর রাখলাম, তখন নুড়িগুলোর জন্য জায়গা ছিল, নুড়ির পর বালির জায়গা ছিল, এবং বালির পর জলের জায়গা ছিল। আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজের ধারায় যদি অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলো, কৃষ্ণভাবনামূলক কাজগুলো আগে রাখি, তবে তার চেয়ে কম জরুরি কাজকর্ম, যদি আমাদের তা থাকে, সেই গুলিকে সব সময়েই স্থান দেবার সুযোগ পাব। কিন্তু যদি কম জরুরি কাজকর্ম প্রথমে দিয়ে সময় ভর্তি করি–নুড়ি পাথর, বালি আর জল–তাহলে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজকর্মগুলোর–বড় পাথরের–জন্য কোন জায়গাই থাকবে না। অতএব আমাদের দিন ও সপ্তাহের রুটিন এমনভাবে করব যাতে হরেকৃষ্ণ জপ করার, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ করার, কৃষ্ণভক্তদের সেবা করার জন্যও সময় নির্ধারিত থাকবে। তা হলে আমাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে সার্থক হবে।

কেউ ভাবতে পারে, এত রকম দায়িত্ব ও ব্যস্ততার মধ্যে কি করে শ্রীকৃষ্ণের জন্য সময় আলাদা করে রাখব? দেখা যাক–অম্বরীষ মহারাজ কিভাবে তা করেছিলেন। যদিও তিনি ছিলেন পৃথিবীর সম্রাট, তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্য সময় উৎসর্গ করেছিলেন, এবং ভগবানের কৃপায় তাঁর রাজ্য এবং সাম্রাজ্য ধন-ধান্যে ধন্য হয়ে উঠেছিল –

মহারাজ অম্বরীষ তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের ধ্যানে মগ্ন করেন, তাঁর বাণী দিয়ে তিনি বৈকুণ্ঠের গুণবর্ণনা করেন, তাঁর হাত দিয়ে তিনি ভগবানের মন্দির মার্জনা করেন, তাঁর কান দিয়ে তিনি ভগবানের লীলা শ্রবণ করেন, তাঁর চোখ দিয়ে ভগবানের সচ্চিদানন্দময় রূপ দর্শন করেন, তাঁর দেহ দিয়ে ভক্ত-দেহ স্পর্শ করেন, তাঁর নাক দিয়ে ভগবানের শ্রীচরণে অর্পিত ফুলের ঘ্রাণ গ্রহণ করেন, তাঁর জিহ্বা দিয়ে ভগবানকে অর্পিত তুলসীর স্বাদ আস্বাদন করেন, তাঁর পদদ্বয় দ্বারা ভ্রমণ করে ভগবানের মন্দিরে গমন করেন, তাঁর মস্তক দিয়ে তিনি ভগবানকে প্রণাম করেন এবং তাঁর কামনা দিয়ে তিনি ভগবানের কামনা পূর্ণ করেন। এই সমস্ত গুণাবলি তাঁকে ভগবানের 'মৎ-পরঃ' ভক্ত করে তোলে। এইভাবেই, মহারাজ অম্বরীষ তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে ভক্তিমূলক সেবায় ও ভগবানের সাথে সম্বন্ধযুক্ত বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত করেছিলেন। রাজা হিসাবে তাঁর দায়িত্ব কর্তব্য পালন কালে মহারাজ অম্বরীষ তাঁর রাজ দরবারের সমস্ত কার্য অনুষ্ঠানের ফলাফল অর্পণ করতেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে–যিনি হলেন সব কিছুরই ভোক্তা।' অম্বরীষ মহারাজ একনিষ্ঠ ভক্তদের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতেন, এবং এইভাবে পৃথিবী গ্রহটি বিনা বিঘ্নে শাসন করেছিলেন।

ভগবানের ইচ্ছায় মহারাজ অম্বরীষ এই সমস্তই খুব সহজে করেছিলেন।

আমাদের শুধুমাত্র শ্রদ্ধা দরকার :

"শ্রদ্ধা'-শব্দে–বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণভক্তি কৈলে সর্ব কর্ম কৃত হয়"॥

"শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দিব্য প্রেমময় সেবা অর্পণ করলে, আপনা-আপনিই তার সমস্ত দায়িত্ব-কর্তব্য-কর্ম সারা হয়ে যায়। ভক্তিসেবার অনুকূলে এই যে বিশ্বাস, দৃঢ় প্রত্যয়, তাকেই বলে শ্রদ্ধা। (–শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২/৬২)

এখন শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় আমরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সংস্পর্শে এসেছি এবং জীবনের চরম লাভটি কি–তা উপলব্ধি করার একটা সুযোগ পেয়েছি। আমরা শ্রীল প্রভুপাদের কথা শুনতে পারি, তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করতে পারি এবং তাঁর উদ্দেশ্য সফল করার কাজে হাত লাগাতে পারি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে ঘোষণা করেছেন, "মদ্ভক্ত-পূজাভ্যধিকা' : "আমার সেবায় সরাসরি নিযুক্ত হওয়ার চেয়ে আমার ভক্তের সেবায় নিযুক্ত থাকা অধিক শ্রেয়স্কর।" (শ্রীমদ্ভাগবত ১১/১৯/২১) সুতরাং বলা যায়–এখনি আমরা-

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

জপ ও কীর্তন শুরু করি–শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁর ভক্তগণের অনুসরণে।

এখন .... এখনই সেই সময়।

(বর্তমানে মুম্বাই, মরিসাস, স্পেন, পর্তুগাল, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অন্যান্য জায়গায় ইসকন গভর্নিং বডি কমিশনার হিসাবে শ্রীমদ্ গিরিরাজ স্বামী সেবারত।)

নিমাই পণ্ডিতের অপ্রাকৃত অস্তিত্ব

২২ জুন ১৯৯৫ শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরকক্ষে প্রদত্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাবিষয়ক প্রবচন থেকে সংকলিত

-শ্রীমৎ মহানিধি স্বামী

মহাপ্রভুর একটি দিব্য লীলা আছে যেখান থেকে আমরা দেখতে পাই যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গলাভে, তাঁর দর্শনে, দিব্য নামগান শ্রবণে কি ফললাভ হয়, এবং অনেক দূর থেকে হলেও তাঁর শুদ্ধ ভক্তের সেবা করলে কি প্রতিক্রিয়া হয়, তাও দেখতে পাই।

এক মুসলমান দর্জির উদাহরণ রয়েছে। সে মাংসাশী ছিল, কিন্তু শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহের কাছাকাছিই থাকত এবং জামা কাপড় সেলাইয়ের কাজে শ্রীবাস ঠাকুরের সেবা করত। একদিন সে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হয়ে নৃত্যরত অবস্থায় দেখতে পেল, আর নিজে বিমোহিত হয়ে পড়ল। পরমাত্মারূপে সকলের অন্তরে অবস্থানকারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার মন বুঝতে পারলেন। তখন তার সামনে এসে তাকে নিজের পরম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন দান করলেন। এই রূপ দেখে অপ্রাকৃত আনন্দে মগ্ন হয়ে সেই দর্জিটিও নৃত্য করতে লাগল এবং মহাপ্রভুও তার সাথে নৃত্য করতে লাগলেন। সেই দর্জি তখন ভগবৎপ্রেমে এতই মগ্ন হয়ে উঠেছিল যে, সে কাঁদতে লাগল আর তার দেহের লোম সোজা হয়ে উঠল। এর ফলে মুসলমানটি মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে ভগবানের এক মহান ভক্ত হয়ে উঠল। যেহেতু সে শ্রীবাস ঠাকুরের সেবা করছিল, এমনিতেই তাঁর অনেক কৃপা সে লাভ করেছিল, আর এখন স্বয়ং ঈশ্বরের কৃপালাভে সে ধন্য হয়ে গেল।

আরো একটি লীলা – যেখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রথম পরমেশ্বর রূপে তাঁর স্বরূপের পরিচয় দেন, সেটা ঘটে শ্রীবাস পণ্ডিতেরই বাড়িতে। ঘটনাটি হয়েছিল এই রকম– ঈর্ষান্বিত লোকেরা যারা মহাপ্রভুর নিন্দা করত, তারা একটা গুজব তুলল যে, কাজী মহাশয় কীর্তনের সংবাদ পেয়ে দু'নৌকো ভর্তি সেপাই পাঠাচ্ছে। নবদ্বীপে যারাই কীর্তন করবে তাদের সম্পত্তি লুটপাট করে তাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে সেই সব সেপাইরা।

শ্রীবাস ঠাকুর তখন এর প্রতিক্রিয়া রোধ করতে এবং পবিত্র ধাম ও ভক্তমণ্ডলীকে সুরক্ষা দান করতে নৃসিংহদেবের পূজা শুরু করলেন, যেমন আমরা এখন ইস্কনে করে থাকি। কারণ শ্রীকৃষ্ণের থেকে, তাঁর স্মৃতি থেকে, তাঁর ভক্তদের থেকে আমাদের দূরে রাখে এমন যে কোনো জিনিস নৃসিংহদেব নাশ করেন, তিনি হলেন 'ভক্তিবিঘ্ননাশনঃ'।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত চৈতন্যভাগবতে এই সম্বন্ধে বর্ণনা রয়েছে – "পরমেশ্বর ভগবান যতক্ষণ না নিজেকে প্রকাশ করছেন, ততক্ষণ কারোর ক্ষমতা নেই তিনি কে, তা
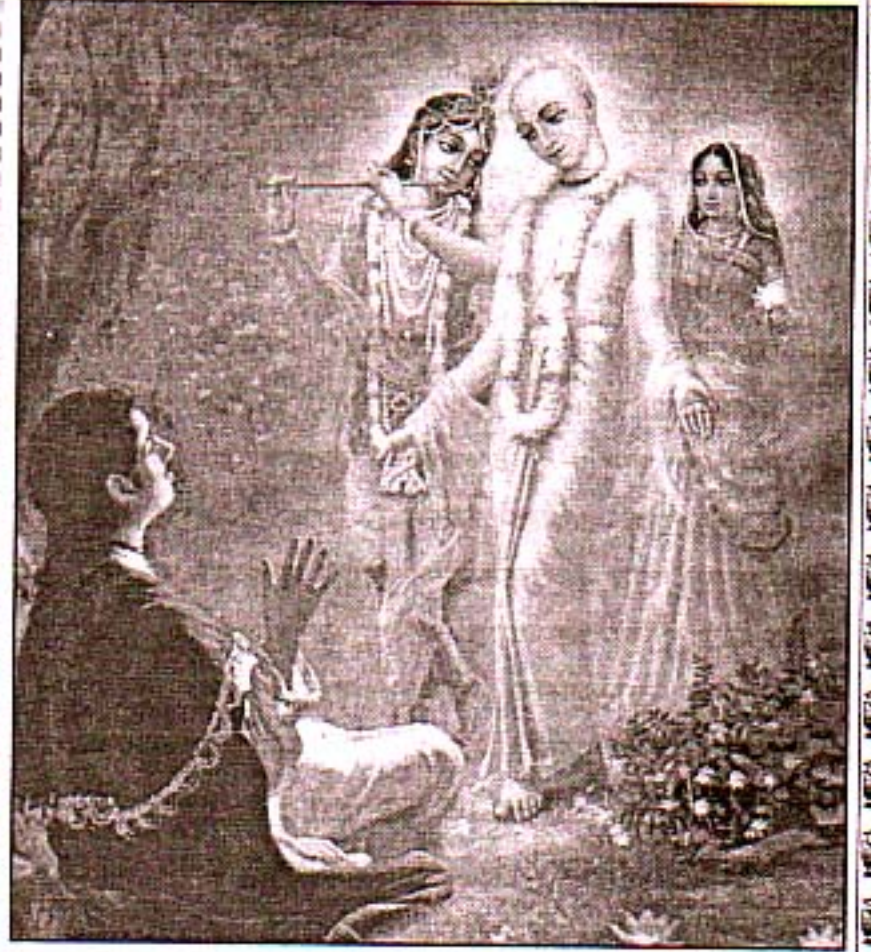
জানার। যদিও ভগবান নবদ্বীপে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে এসে শ্রীবাস পণ্ডিত ও অন্যান্য সঙ্গীদের সাথে লীলা করছিলেন, সেই সময় তাঁরা বুঝতে পারেন নি তিনিই পরম পুরুষোত্তম ভগবান। নিমাই পণ্ডিতের অপ্রাকৃত অস্তিত্ব তাঁরা চিনতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও নবদ্বীপের সকলের মন প্রাণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমভক্তিতে আপ্লুত হয়েছিল। বড় হয়ে নিমাই গয়ায় যান ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করতে। তারপর তিনি বিশ্ব জুড়ে হরিনাম সংকীর্তনের সম্প্রচার শুরু করেন। দিবারাত্র মহাপ্রভু কীর্তন-মাধুর্য রসে মগ্ন থাকতেন। এতে সব চেয়ে আনন্দ পেতেন শ্রীবাস পণ্ডিত ও অদ্বৈত আচার্যের মতো নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ। তাঁরা মনে শান্তি পেতেন, কিন্তু অভক্তের দল বড়ই বিচলিত হয়ে উঠেছিল। নবদ্বীপের নাস্তিকেরা হরিনাম সংকীর্তনে এতই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল যে, তারা ভক্তদের অপমান করতে ছাড়ছিল না।"

এই রকম অবমাননার ঘটনার বর্ণনা আমরা পেয়েছি। শ্রীবাস পণ্ডিত বেশ চিন্তিত বোধ করছিলেন এই কাজীর সৈন্যদের আগমনের গুজব শুনে। নিজের জন্য চিন্তা তাঁর ছিল না। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বর্ণনা অনুসারে, একজন শুদ্ধ ভক্ত সব কিছুতেই সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে থাকেন,

(চলবে)

মহামন্ত্রের বিভ্রান্তি

– শ্রী মাধবমুরারী দাস ব্রহ্মচারী

বলরাম যখন বৃন্দাবনে ছিলেন না, তখন অজ্ঞ ও মিথ্যাভিমানী করূষ দেশের রাজা পৌণ্ড্রক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এক দূত পাঠিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ লীলা পুরুষোত্তম ভগবানরূপে সর্বজনস্বীকৃত ছিলেন। দূতের মাধ্যমে পৌণ্ড্রক জানায় যে, শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব নয়; পক্ষান্তরে সে বাসুদেব বা ভগবান স্বয়ং। এইভাবে দূতের মারফৎ পৌণ্ড্রক সোজাসুজি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভগবত্তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। আজকাল এই রকম অজ্ঞ ও মূঢ়দের বহু অনুগামী রয়েছে। সেই রকম ঐ সময় বহু মূঢ় পৌণ্ড্রককে লীলা পুরুষোত্তম ভগবান বলে গ্রহণ করেছিল। নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশত সে নিজেকে ভগবান বাসুদেব বলে মিথ্যা অভিমান করত। এই ভাবে দূত শ্রীকৃষ্ণের কাছে ঘোষণা করেছিল যে, নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত ব্যক্তিদের উদ্ধারের জন্য লীলা পুরুষোত্তম ভগবান রাজা পৌণ্ড্রক এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন।

বহু অজ্ঞ ব্যক্তি পরিবেষ্টিত মূঢ় পৌণ্ড্রক বস্তুত নিজেকে লীলা পুরুষোত্তম ভগবান বলে সিদ্ধান্ত করেছিল। এই রকম সিদ্ধান্ত নিশ্চয় বালকোচিত। খেলার সময় বালকেরা কখনও কখনও তাদের মধ্যে থেকে একজনকে রাজা নির্বাচিত করে এবং নির্বাচিত বালকটি নিজেকে রাজা বলে মনে করে। সেই রকম বহু মুর্খ অজ্ঞতাবশত তাদের মধ্য থেকে একজনকে ভগবান বলে নির্বাচিত করে; তখন সেই মূর্খও নিজেকে ভগবান বলে বিবেচনা করে। ভগবান যেন এমন সত্তা, গণভোটের মাধ্যমে বা বালকোচিত খেলার মাধ্যমে তাঁকে সৃষ্টি করা যায়! এই রকম মিথ্যা অভিমানের বশবর্তী হয়ে, নিজেকে স্বয়ং পরমেশ্বর মনে করে, পৌণ্ড্রক শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম চিহ্ন দিয়ে ভূষিত হয়েছে। সে শার্ঙ্গ ধনুক বহন করছিল; তার বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন ছিল। পীতবসন পরিধান করে, ভগবান বাসুদেবের মতো পুষ্পমালায় ভূষিত হয়ে, সে কণ্ঠে কৃত্রিম কৌস্তভ মণি ধারণ করেছিল।

এই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রককে বললেন, "পৌণ্ড্রক, তুমি আমাকে বিষ্ণুর চিহ্নগুলি ত্যাগ করতে অনুরোধ করেছিলে, বিশেষত আমার চক্রটি। এখন আমি এই চক্রটি তোমার উদ্দেশ্যে ত্যাগ করছি; সাবধান হও। আমার অনুকরণ করে তুমি নিজেকে বাসুদেব বলে মিথ্যা ঘোষণা করেছিল। তাই তোমার চেয়ে বড় মূর্খ আর কেউ নেই।" শ্রীকৃষ্ণের এই কথায় স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, মূর্খই নিজেকে স্বয়ং ভগবান বলে জাহির করে। মানব-সমাজে সেই সব চেয়ে বড় মূঢ় ও নির্বোধ, যে নিজেকে ভগবান বলে দাবি করে। ভগবান প্রকট থাকা অবস্থায় পৌণ্ড্রকের মত ব্যক্তি ভগবান বলে যদি দাবি করতে পারে। আর এখনকার কথাতো বলাই বাহুল্য। এখন শুধু ভগবান সেজেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা নানা রকম মহামন্ত্র সৃষ্টি করে সমাজে যে জটা জাল সৃষ্টি করেছে সেই বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই। শাস্ত্রে চারি যুগে চারটি মহামন্ত্র নির্দিষ্ট থাকা সর্ত্ত্বেও আজকাল বহু মহামন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে।

চারি যুগের চারটি নির্দিষ্ট মহামন্ত্র

সত্যযুগের মহামন্ত্রঃ

নারায়ণ পরা বেদা নারায়ণ পরাক্ষরা।
নারায়ণ পরামুক্তি, নারায়ণ পরাগতি॥

ত্রেতাযুগের মহামন্ত্রঃ

রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে, হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥

দ্বাপর যুগের মহামন্ত্রঃ

হরে মুরারে মধু কৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাম্ জগদীশ রক্ষ॥

কলিযুগের মহামন্ত্রঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
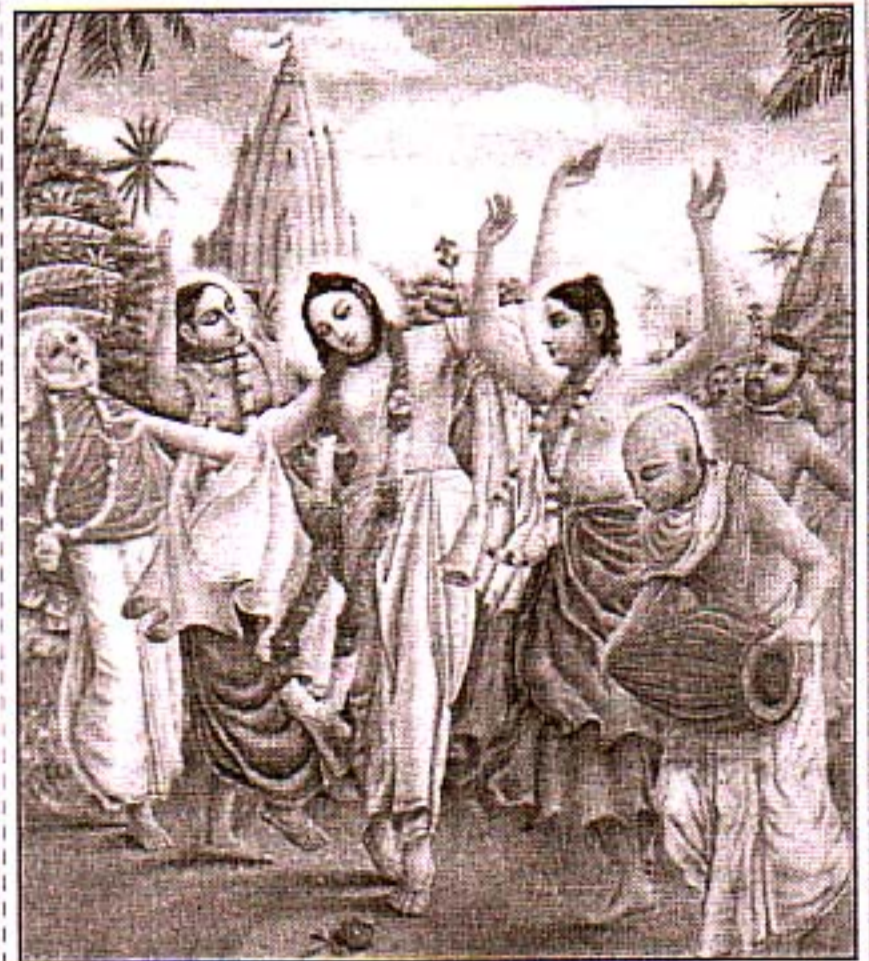
এই নির্দিষ্ট মহামন্ত্রের বিকল্প অনেক প্রকার নাম কীর্তন বাংলাদেশ সহ অনেক স্থানে গীত হয়। ঐগুলি যুগানুকূল কিনা-তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন মনে করছি না; তবে শতাধিক মন্ত্র তৈরী করে জটিলতা সৃষ্টি করাটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। নতুন নতুন মন্ত্র সৃষ্টি করার মাঝে আর যাই থাক ঐক্য নেই, সমুচ্চয়ী মনোভাব নেই, আছে সাম্প্রদায়িকতার বিষ এবং"যেমন খুশী তেমন সাজ" পাগলামীযুক্ত ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ মনের পরিচয়।

সুধী সমাজের সদয় অবগতির নিমিত্তে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের নামকীর্তনের তথা বিকল্প কীর্তনের পরিচয় দেওয়া হলো–

১। ভোলার লালমোহন এলাকায় অনিল সাধু প্রবর্তিত নাম কীর্তন–

জয় রাধে গোবিন্দ, শ্রীমধুসূদন নমঃ নারায়ণ হরে।

২। কুমিল্লা জেলার সাতমোরা উপজেলার আচার্য মনমোহন দত্তের

আচার্য প্রবর্তিত নাম কীর্তন–

জয় শিব হরে কৃষ্ণ কালী দয়াময়।

৩। ফরিদপুর জেলার শ্রীধাম ওড়াকান্দিতে হরিচাঁদ ঠাকুরের আশ্রমে মতুয়া সম্প্রদায় কর্তৃক নাম কীর্তন–

হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

৪। পাবনা জেলার হিমাইতপুরে শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত নাম –

রাধা-স্বামী

৫। পাবনা জেলার শাহজাদপুর উপজেলার পোরজোনা গ্রামের রঘুনাথ চৈতন্যের আশ্রমের নাম কীর্তন–

হা গৌরাঙ্গ! হা গৌরাঙ্গ! হা গৌরাঙ্গ!

৬। নরসিংদিতে কবি হরি আচার্য প্রবর্ত্তিত নাম কীর্তন–

বিষ্ণু প্রিয়ার প্রাণধন নদীয়া বিহারী।

৭। ঢাকার 'বুড়ো শিবের' গুরুদেব ব্রম্মানন্দস্বামী প্রবর্ত্তিত নাম কীর্তন–

হরে হরে ব্রজেন্দ্র, ব্রজ মুরারে
রাম নারায়ণ, গৌর হরি, রাম নারায়ণ বেদসে ॥

৮। কুমিল্লা জেলার দাউদকান্তি উপজেলার ঝিংলাতলী গ্রামের জগদানন্দের শিষ্য অশ্বিনী গোসাঁই প্রবর্ত্তিত নাম কীর্তন–

প্রাণ গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ।

৯। ফরিদপুর জেলার শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গণে, জগৎবন্ধু সুন্দরের প্রবর্ত্তিত নাম কীর্তন–

"হরিপুরুষ জগবন্ধু মহাউদ্ধারণ।
চারিহস্ত চন্দ্র পুত্র, হা কীট পতন।
প্রভু প্রভু প্রভু হে অনন্তানন্তাময় ॥

১১। ভারতের প্রখ্যাত সাধক বালক ব্রহ্মচারী প্রবর্ত্তিত নাম কীর্তন–

রাম নারায়ণ রাম।

১২। বঙ্গ ভারতের অনেক স্থানে গৌরভক্ত বলে পরিচয় দান কারী ভক্তগণ নিম্নরূপ নাম কীর্তন করে থাকেন–

ভজ নিতাই গৌর রাধের শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

ইত্যাদি ইত্যাদি, নতুন নতুন মন্ত্র রচনা করে কেহ কেহ জপ করছেন কেহবা কীর্তন করছেন,এদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় আছে যারা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রকে পৌরানিক বলে মনে করে নতুন মহামন্ত্র সৃষ্টি করে জপ-কীর্তন করে থাকেন। আবার অনেকেই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রকে বীজমন্ত্র হিসাবে গ্রহন করে জপ করেন কিন্তু কীর্তন করেন না। তাদের মতে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা যাবে না। শুধু মাত্র মনে মনে জপ করা যাবে। এই জপ প্রসঙ্গে মহাপ্রভু শ্রী শ্রী চৈতন্যভাগবতে কি বলেছেন-,

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র।
ষোল-নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র ॥
পশু-পক্ষী কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে ॥
জপিলে শ্রীকৃষ্ণনাম আপনে সে তরে।
উচ্চ-সংকীর্তনে পর-উপকার করে ॥
অতএব উচ্চ করি কীর্তন করিলে।
শতগুন ফল হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে ॥

তাই অজ্ঞ অনুন্নত দারিদ্র পীড়িত জনগোষ্ঠীর মাঝে নতুন নতুন মহামন্ত্র সৃষ্টি করে যে বিভেদের জটাজাল সৃষ্টি করে তা মারাত্মক ক্ষতিকর। এগুলি মানুষের মাঝে ধর্ম বিশ্বাস ও ঈশ্বর বিশ্বাসকে ক্ষুন্ন করে। তাছাড়া সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি ও বিভেদ সৃষ্টিসহ অন্ধকে আরও অন্ধকারে নিমজ্জিত করে, ঈশ্বর বিশ্বাসের উদ্দেশ্যে ব্যহত হয়।

ঈশ্বর বিশ্বাসকে কোনঠাসা করা হয়, তাই বিষয়গুলি বিবেচনা করার জন্য সুধী পাঠক-পাঠীকার হাতে ছেড়ে দিলাম।

কলিযুগে হরেকৃষ্ণ নাম একটাই। বিশ্বনন্দিত, বিশ্বপরিচিত, বিশ্বকীর্ত্তিত, বিশ্বে বহুল প্রচারিত এবং বিশ্বজন কর্তৃক স্বীকৃত আগ্রহ ভরে গৃহীত। তা হলো–

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই মহামন্ত্রকে বাদ দিয়ে নিজেদের তৈরী মনগড়া মহামন্ত্র দিয়ে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। নামযজ্ঞ সম্পর্কে

বাকী অংশ ১০পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

স্মরণীয় সেপ্টেম্বর

-শ্রীসঙ্কর্ষণ দাস

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন এক একটি ঘটনা ঘটে যা সারাজীবনে বিশেষভাবে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকে। অতীতের কোনো কোনো ঘটনা আমাদের স্মৃতিপটে এমনভাবে রেখাপাত করে যে, আমরা তা কখনো ভুলতে পারি না, তা আমাদের জীবনে হয়ে থাকে অবিস্মরণীয়।

এ রকম কয়েকটি স্মরণীয় ও অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত জীবনে। প্রভুপাদের অনুগামীদের কাছে 'সেপ্টেম্বর মাস' এক স্মরণীয় মাস রূপে পরিচিত।

প্রথমেই আমরা সেপ্টেম্বর মাসটিকে স্মরণ করতে পারি শ্রীল প্রভুপাদের জন্মমাস হিসাবে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর এক অবিস্মরণীয় তাৎপর্যময় দিন। এই পরম পবিত্র দিনটিতে শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, শ্রী অভয়চরণ দে নামে মধ্য কলকাতার এক বর্ধিষ্ণু সুবর্ণবণিক বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শ্রীগৌরমোহন দে ও মাতা শ্রীমতী রজনীদেবী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একনিষ্ঠ শুদ্ধভক্ত ছিলেন।

১৮৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই শ্রীল প্রভুপাদের পিতামাতা একজন স্বনামধন্য জ্যোতিষীকে দিয়ে শ্রীল প্রভুপাদের একটি ঠিকুজি করিয়েছিলেন। সেই ঠিকুজি প্রণেতা একটি ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছিলেন যে, তাঁর বয়স যখন ৬৯ বছর হবে, তখন তিনি পাশ্চাত্যদেশে পাড়ি দেবেন ও এক বিশ্ববন্দিত ধর্মপ্রচারক রূপে সারাবিশ্বে অভাবনীয় স্বীকৃতি লাভ করবেন। আজ আমরা লক্ষ্য করছি যে, পৃথিবীর সমস্ত দেশে সমস্ত ভাষাভাষীর মানুষের হৃদয়ে শ্রীল প্রভুপাদ সত্যিই এক মহামানব রূপেই পূজিত হচ্ছে।

প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বকর্মা পূজা হয়ে থাকে। এই দিনটা আমাদের কাছে ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত হয়ে থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ যখন ৯/১০ বৎসরের বালক, তখন তিনি ঘুড়ি ওড়াতে শুরু করেন। তাঁর ছোট ভাই কৃষ্ণচরণ প্রভু আমাদেরই বাড়িতে থাকতেন। তাঁর শ্রীমুখ থেকে শ্রীল প্রভুপাদের শৈশবলীলার অনেক অলৌকিক কাহিনী সৌভাগ্যবশত আমরা শুনেছি, যা আমাদের স্মৃতিপটে আজও অম্লান হয়ে আছে।

শ্রীল প্রভুপাদ বাল্যকালে ঘুড়ি ওড়াতে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর ঘুড়ি ওড়ানোটা ছিল ভারী মজার ঘটনা। মহাত্মা গান্ধী রোডের মল্লিক বাড়ির তিনতলার ছাদে তিনি ঘুড়ি ওড়াতেন, আর সময়ে সময়ে এই ঘুড়ি ওড়াতে তাঁকে সাহায্য করত তাঁর ছোট ভগ্নী ভবতারিণীদেবী ও ছোট ভাই কৃষ্ণচরণ প্রভু। শ্রীমতী ভবতারিণীদেবী প্রায়ই বলতেন, 'যখন সকলবেলায় আমাদের ঘুড়ি না উড়ত, তখন আমরা দুজনে মিলে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতাম।

১৯৭০ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখটি আমার জীবনে একটি স্মরণীয় দিন রূপে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সেদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ঘুড়ি ওড়ানোর প্রাণবন্ত নেশা আমাকেও পেয়ে বসেছিল। তাই সেদিন ঘুড়ি ওড়ানোর শেষে সন্ধ্যার দিকে আমি শ্রীল প্রভুপাদকে দর্শন করতে গেলাম।

টালিগঞ্জ থেকে ট্রামে উঠে গড়িয়াহাট মোড়ে নামলাম। হিন্দুস্থান রোডের ঐ বাড়িটি ছিল আমার অজানা। তাই বাড়িটি খুঁজে বের করতে আমার বেশ সময় লাগল। অবশেষে ৩৭/১ বি, হিন্দুস্থান রোডের বাড়িটিতে গিয়ে পৌঁছালাম।

বাড়িতে প্রবেশ করেই দেখলাম অনেক অতিথির সমাগম হয়েছে শ্রীল প্রভুপাদকে দর্শন করার উদ্দেশ্যে। বাড়ির চারিদিকে সুবাসিত ধূপের সৌরভ সকলকে আকর্ষণ করছিল। একতলার দেওয়ালে শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটি মনোরম তৈলচিত্র ঝুলছিল। আর তাতে পরানো ছিল সুন্দর সুন্দর রজনীগন্ধার মালা।

একতলার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলাম। ডানদিকের ছোট একটি ঘরে প্রবেশ করে দেখি শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর দিব্য উপস্থিতির দ্বারা আলোকিত করে ব্যাসাসনে উপবিষ্ট হয়ে অতিথিদের মধ্যে হরিকথা পরিবেশন করছেন। ভূমিষ্ঠ হয়ে শ্রীল প্রভুপাদকে প্রণাম নিবেদন করলাম। তখন তিনি স্নিগ্ধ নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে বসতে বললেন। তাঁর সামনে একটা মোটা সাদা রংয়ের তোষক পাতা ছিল। সেই তোষকে আমি প্রভুপাদের মুখোমুখি হয়ে বসলাম। তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমার বিস্তারিত পরিচয় পেয়ে যখন তিনি জানতে পারলেন যে, আমি তাঁর পরিবারেরই নিকটজন, তখন তিনি সানন্দে অভিভূত হয়ে আমার সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে অনেক কথা বললেন। তিনি আমার বাবা, মা, জ্যৈষ্ঠ ও পরিবারের অন্যান্যদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

আমরা কে কোথায় বসবাস করছি, সেই সম্বন্ধেও

জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন– আমরা টালিগঞ্জের সেই পূর্বের বাড়িতেই আছি কিনা? সেদিন প্রায় ঘণ্টা দু-য়েক তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল।

এইভাবে তাঁর অতীত-শৈশবের স্মৃতিচারণ করতে করতে সেদিন (১৭ই সেপ্টেম্বর) তিনি নিচে নামলেন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ দেওয়ার জন্য। তাঁর সঙ্গে তাঁর শিষ্যরাও নামলেন। একতলায় নেমে ব্যাসাসনে উপবিষ্ট হয়ে তিনি প্রথমে 'জয় রাধামাধব' ভক্তিগীতিটি গেয়ে শুরু করলেন গীতা পাঠ। প্রায় ঘণ্টা খানেক গীতার পাঠ চলেছিল। পাঠ শেষ হওয়ার পর শ্রীল প্রভুপাদ নিজ হাতে সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করলেন।

সেদিন হিন্দুস্থান রোডের ঐ বাড়িটিতে স্থানীয় কিছু লোকও পাঠ শুনতে এবং মন্দির দর্শন করতে এসেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের পাঠ শুনে যখন অতিথিরা চলে গেলেন, তখন তিনি কয়েকজন বিদেশী ভক্তের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেদিন পরিচয় হলো– শ্রীমৎ জয়পতাকা মহারাজ ও শ্রী অচ্যুতানন্দের সাথে। প্রথম পরিচয়ের দিনে তাঁদের বৈষ্ণবোচিত ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। দেখতে দেখতে রাত্রি ৯টা বেজে গেল। শ্রীল প্রভুপাদ 'হরেকৃষ্ণ' বলে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে দোতলার নিজের ঘরে উঠে গেলেন। আমিও শ্রীল প্রভুপাদকে প্রণতি জানিয়ে সেদিনের মতো বাড়ি ফিরলাম।

১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীল প্রভুপাদ অ্যালবার্ট রোডের বাড়িটি ভাড়া নেওয়ার জন্য কথাবার্তা বললেন। তিনি মাত্র ১,১০০ টাকায় ঐ বিশাল বাড়িটির এক অংশ ভাড়া নিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই হিন্দুস্থান রোড থেকে মন্দিরটি ৩-এ, অ্যালবার্ট রোডে উঠে এল। রায়দের ঐ বিশাল বাড়িতেই প্রতিষ্ঠা হলো শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মনোরম মন্দির।

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা মন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদ রাধাষ্টমীর ব্রত উদ্‌যাপন করেছিলেন। শ্রীমতী রাধারাণীর শুভ আবির্ভাব তিথিতে সেদিন অনেক ভক্তজনের সমাগম হয়েছিল। শ্রীল প্রভুপাদ সেদিন কলকাতার মন্দিরে এক মনোজ্ঞ প্রবচনে শ্রীমতী রাধারাণীর অপ্রাকৃত গুণমহিমা বর্ণনা করলেন। আর ঐ শুভদিনটিতে তিনি আমাদের প্রিয় গুরুভ্রাতা শ্রীমৎ জয়পতাকা মহারাজকে সন্ন্যাস দিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের কাছে থেকে শ্রীমৎ জয়পতাকা মহারাজ চিরকুমার ব্রহ্মচারী থেকে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। নাম হলো– শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রদত্ত সেই নাম সত্যিই সার্থক হয়েছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্য নাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন ক্রিয়াপদ্ধতির উদ্ভাবন করে সারা পৃথিবীতে দিগভ্রান্ত ও মতিচ্ছন্ন মানুষকে শ্রীকৃষ্ণভাবনার সুধাময় পরিবেশে নিয়ে এসেছেন। শ্রীমৎ জয়পতাকা মহারাজ যেখানেই যান, সেখানেই শ্রীহরিনামের বিজয় পতাকা উড্ডয়ন করেন। এটাই তাঁর শ্রীকৃষ্ণকথা প্রচারের বিশেষ নিপুণতা। তিনিই একমাত্র বিদেশী শিষ্য যিনি শ্রীল প্রভুপাদের পূণ্যজন্মভূমি শ্রীধাম কলকাতায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সেই স্মরণীয় অনুষ্ঠানে আমারও উপস্থিত থাকার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল।

সেপ্টেম্বর মাস শ্রীল প্রভুপাদের জীবনে নানা কারণে এক স্মরণীয় মাস হিসাবে প্রতিভাত হয়। কারণ এই সেপ্টেম্বর মাসেই তিনি জন্মেছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসেই তিনি আমেরিকার মাটিতে প্রথম পদার্পণ করেন, আর এই সেপ্টেম্বর মাসেই তিনি পাশ্চাত্যদেশের মানুষকে প্রথম দীক্ষা প্রদান করে শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের বীজ বপন করেছিলেন।

১৯৬৫ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর 'জলদূত' জাহাজটি নিউইয়র্ক বন্দরে পৌছে ব্রুকলিন বন্দরে নোঙর ফেলল। শ্রীল প্রভুপাদের জাহাজ বাস শেষ হলো।

শ্রীল প্রভুপাদের পরনে ছিল প্রকৃত ব্রজবাসীর পোশাক তাঁর কপালে ছিল সুন্দর তিলকসেবা, গলায় কণ্ঠিমালা, হাতে জপমালা, পরনে গেরুয়া সুতির বহির্বাস, পায়ে একজোড়া সাদা রবারের জুতো, যা ভারতবর্ষের সাধুদের পায়ে দেখা গেলেও, আমেরিকায় কেউ কখনো দেখেন নি। নিউইয়র্কে কেউ কখনো স্বপ্নেও এরকম বৈষ্ণবকে দেখার কল্পনা করে নি, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তিনি আমেরিকার মাটিতে পৌছে সেই সাধারণ দীনবেশেই বৈষ্ণব-ধর্মের এক অভূতপূর্ব নবজাগরণ সৃষ্টি করলেন। সে সম্বন্ধে ২২শে সেপ্টেম্বর 'বাটলার ঈগল' পত্রিকায় শ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বেরোয়। তার শিরোনাম ছিল :

'অনর্গল ইংরেজি বক্তা হিন্দুভক্তের পাশ্চাত্যে আগমনের উদ্দেশ্যে বিশ্লেষণ'। একজন ফটোগ্রাফার আগরওয়ালদের বাড়িতে এসে তাঁদের বসবার ঘরে শ্রীমদ্ভাগবত হাতে শ্রীল প্রভুপাদের একটি ছবি তুলে নেয়, সেই ছবির শিরোনামে লেখা ছিল : 'ভক্তিযোগের দূত'। সেই প্রবন্ধে বলা হয়– গৈরিক বসন এবং পায়ে একজোড়া সাদা জুতো পরে ঈষৎ বাদামী রঙের একজন মানুষ গতকাল একটি ছোট গাড়ি থেকে নেমে বাটলার শহরের ওয়াই, এম, সি,এ, ভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় প্রবেশ করলেন। তিনি হচ্ছেন শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী– পাশ্চাত্যের জনগণের কাছে ভারতীয় সংস্কৃতির দূত। শ্রীল প্রভুপাদের অভ্যাসগুলো বর্ণনা করে সেই সাংবাদিক তাঁর প্রতিবেদনে–

(চলবে)

আমি কিভাবে কৃষ্ণভক্ত হলাম

দেশ-বিদেশে ঘুরতে ঘুরতে ব্রাজিলের সাওপাওলোতে ১৯৮৩ সালে হরেকৃষ্ণ ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। সে কী মধুর দৃশ্য। মুণ্ডিতমস্তক, গৈরিক বসনধারী, হাতে জপমালা, মুখে মধুর হরিনাম। ছুটে গেলাম ভক্তদের কাছে।

শ্রীপাদ মরীচি দাস

আমি কিভাবে কৃষ্ণভক্ত হলাম– চমৎকার এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতেই ছেলেবেলার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। যে দেশে আমার জন্ম ,তার নাম হল আর্জেন্টিনা। লাতিন আমেরিকার আর্জেন্টিনা,ব্রাজিল এই দেশ দুটিকে ফুটবল পাগল গোটা বিশ্বের মানুষেরা চেনে। জন্ম থেকেই যে দেশে ছেলেরা ফুটবল-খেলোয়াড় হবার স্বপ্ন দেখে, সেই আর্জেন্টিনার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর, রাজধানী বুয়েন্স আয়ার্সের পাশেই কোরদোভাতে আমার জন্ম হয়; জন্মদিনটি ছিল ১৯৬৩ সালের ১১ই অক্টোবরের এক শীতোষ্ণ সকাল।

আমার বাবা হোরখে সেবুন্দো লেবো– আর্জেন্টিনার প্রখ্যাত ইলেকট্রিক কোম্পানী ই পি ই সি-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। মা সুজানা এলেনা বার্জ্জো। আমি একমাত্র সন্তান হওয়ার দরুন বাবা-মায়ের ইচ্ছা ছিল আমি যেন জীবনে দারুণ কিছু একটা করি। সেই লক্ষ্যে আমাকে ছেলেবেলা থেকেই একটা পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলবার আগ্রহে জড়জাগতিক বিদ্যাশিক্ষা এবং নৈতিক ও পারমার্থিক বিদ্যাশিক্ষার পরিপুষ্ট সুযোগ-সুবিধা সমৃদ্ধ বিখ্যাত 'সেন্ট টমাস' স্কুলে ভর্তি করে দেন।

জড়জাগতিক জ্ঞান আর যিশু শিক্ষার ঈশ্বরতত্ত্ব বিদ্যা প্রকৃতির আশ্রয়ে স্কুল-জীবনে বেশ আনন্দের সঙ্গেই অনুশীলন করতাম। বয়স বাড়তে লাগল; জিজ্ঞাসা, কৌতুহলও বেড়ে গেল। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করেই ভর্তি হলাম 'দেয়ান ফুনেস' কলেজে। কেটে গেল আরও তিনটি বছর। বাবা-মায়ের অতি আগ্রহে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে উচ্চশিক্ষা জীবন শুরু করি 'ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব কোর্দোভা'তে। সাফল্যের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাশিক্ষা শেষেই এই বিশ্ববিদ্যালয়েই শুরু করি আমার অজস্র জিজ্ঞাসার মূল আকর্ষণ দর্শনশাস্ত্র নিয়ে উচ্চশিক্ষা অধ্যয়ন।

এই সময়ে একই সঙ্গে পড়াশুনা এবং আর্জেন্টিনার আয়কর দপ্তরের জেনারেল সেক্রেটারী পদে চাকরিও করতে থাকি। দর্শনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা আমাকে এত গভীরে টেনে নিয়ে যেতে লাগল যে, আমি ভারতীয় দর্শন, আমেরিকা-ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র অনুশীলনে আগ্রহী হয়ে উঠি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনায় সীমিত সুযোগ থাকায় ছেড়ে দিই বিশ্ববিদ্যালয়। মনের টানে এসময় আমি লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। লক্ষ্য একটাই– আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভ করা।

দেশ–বিদেশে ঘুরতে ঘুরতে ব্রাজিলের সাওপাওলোতে ১৯৮৩ সালে হরেকৃষ্ণ ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। সে কী মধুর দৃশ্য। মুণ্ডিতমস্তক, গৈরিক বসনধারী, হাতে জপমালা, মুখে মধুর হরিনাম। ছুটে গেলাম ভক্তদের কাছে। পরিচিত জনদের মতো আমাকে কাছে ডেকে নিলেন জনৈক কৃষ্ণভক্ত; একটি কৃষ্ণগ্রন্থ এবং শ্রীকৃষ্ণের সুদৃশ্য ছবি সহ মন্দিরের ঠিকানা দিলেন। মুগ্ধ হলাম ব্যবহারে। মনে মনে আমি এই হরেকৃষ্ণ ভক্তদের মতোই প্রাণোচ্ছল আনন্দ চিন্ময় রসের অনুভূতি হাতড়ে খুঁজে ফিরছিলাম এতদিন। যাযাবর জীবনে এরপর ঘুরতে ঘুরতে বলিভিয়া, পেরু হয়ে একুয়াদোর রাষ্ট্রে গিয়ে পৌঁছাই। ততদিনে বারে বারে এমন কি রোজই একবার করে পড়ে ফেলি শ্রীল প্রভুপাদের দিব্য কৃষ্ণগ্রন্থ ভাগবত ও গীতার অমিয় শ্লোকাবলী।

এখানেও এক সন্ধ্যায় একুয়াদোরের রাজপথে হরিনাম সংকীর্তন মুখে কৃষ্ণভক্তদের নগর সংকীর্তন দেখে বড় আপনজন ভেবে ছুটে যাই ভক্তদের কাছে; মনের অনুরাগ ইতিমধ্যে ধরা পড়েছে কৃষ্ণভাবনামৃতের আশ্রমে। কৃষ্ণভক্তদের কাছে কৃষ্ণভাবনাময় জীবন শুরুর আগ্রহ প্রকাশ করতেই ভক্তেরা আমাকে সঙ্গে করে মন্দিরে নিয়ে আসেন।

১৯৮৪ সালে যোগ দিলাম ইস্‌কন হরেকৃষ্ণ আন্দোলনে। আমার কৃষ্ণসেবার শুরু হয় ভগবৎ প্রসাদ রন্ধন অধিকারে। বছর না গড়াতেই দীক্ষিত হই হরিনাম মন্ত্রে। শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজ আমাকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দেন।

বাকী অংশ ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

একাদশী তত্ত্ব ঃ একটি গবেষণামূলক বিশ্লেষণ

-শ্রী মনোরঞ্জন দে

(পূর্ব প্রকাশের পর)

২.যোগিনী একাদশীঃ ইস্কন-এর চার্ট অনুযায়ী ২১.০৬.২০০৬ ইং বুধবার একাদশী দিন নির্ধারিত ছিল। গৌড়ীয় মঠের চার্ট অনুযায়ী একাদশীর দিন ছিল ২২.০৬.২০০৬ ইং বৃহস্পতিবার। পুরান শাস্ত্র অনুযায়ী সূর্যোদয়ের ৪ দন্ড পূর্ব থেকেই একাদশী প্রবৃত্ত বা আরম্ভ হওয়া উচিত। আর শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থানুযায়ী সূর্যোদয়ের পূর্বে একাদশী কমপক্ষে ৩.৫ দন্ড থাকা উচিত।

এখন ২০.০৬.২০০৬ ইং মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রি ৩/৫৫/৪সেঃ পর্যন্ত দশমী ছিল, তারপর একাদশী আরম্ভ হয়ে পরদিন ২১.০৬.২০০৬ ইং বুধবার রাত্রি ১/৫৫/৫১ সেঃ পর্যন্ত ছিল। ঐদিন প্রাতে সূর্যোদয় ৫/২৪/১৮সেঃ গতে ছিল। এ থেকে ৪দন্ড অর্থাৎ ১ ঘন্টা ৩৬ মিনিট বাদ দিলে মঙ্গলরাত্রি ৪/৪৮/১৮ সেঃ হয়। একাদশী মঙ্গলবার রাত্র ৩/৫৫/৪সেঃ গতে আরম্ভ হয় অর্থাৎ ৪/৪৮/১৮সেঃ এর পূর্বে আরম্ভ হয়। তাই পুরান শাস্ত্র অনুযায়ী এটি অরুনোদয় বিদ্ধা বা দমশী বিদ্ধা হয় নাই। গৌড়ীয় মঠ মনে হয় ভুল করে ২১/০৬/২০০৬ইং বুধবার একাদশীর দিন নির্ধারন না করে ২২/০৬/২০০৬ইং বৃহস্পতিবার নির্ধারণ করে।

আবার শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ অনুযায়ী ৩.৫০ দন্ডকে ভিত্তি করে একাদশীর দিন নির্ধারণ করলেও দেখা যায় ৩.৫০ দন্ড = ২৪X৩.৫০ = ৮৪ মিনিট = ১ঘন্টা ২৪ মিনিট। এখন সূর্যোদয় ৫/২৪/১৮ সেঃ থেকে ১ঘন্টা ২৪ মিনিট বাদ দিলে মঙ্গলবার রাত্রি ৪/০/১৮ সেঃ পড়িয়া যায়।

একাদশী এর পূর্বেই আরম্ভ হয়েছিল। তাই শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ অনুসরণ করলেও ২২/০৬/২০০৬ইং বৃহস্পতিবার না হয়ে ২১/০৬/২০০৬ ইং বুধবার একাদশী হওয়ার কথা। তাই ইসকন কর্তৃক নির্ধারিত দিনই সঠিক বলে মনে হয়।

৩. পবিত্রারোপন একাদশীঃ গৌড়ীয় মঠের চার্ট অনুযায়ী ৫/৮/২০০৬ ইং শনিবার একাদশীর দিন নির্ধারিত। ইসকন এর চার্ট অনুযায়ী ৬/৮/২০০৬ইং রবিবার একদশী দিন নির্ধারণ দেখতে পাওয়া যায়। ৪/৮/২০০৬ইং শুক্রবার রাত্রি ১১/৪৩/২৮সেঃ পর্যন্ত দশমী ছিল। পরে একাদশী আরম্ভ হবে। এই সময় বিবেচনা করলে একাদশীটি কোন মতেই দশমীবিদ্ধা বলা যাবে না। এমনকি এটি কপালবিদ্ধাও বলা যায় না। আগেই বলেছি খুব সম্ভবত: গৌড়ীয় মঠ দশমী বিদ্ধার উপর গুরুত্ব দেয়। কাজেই ঐ মঠের চার্ট অনুযায়ী ৫/৮/২০০৬ইং তারিখে শনিবার একাদশীর দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইস্কন চার্টে ৬/৮/২০০৬ ইং রবিবার একদশীর দিন- অর্থাৎ দ্বাদশীর দিন একাদশীব্রত নির্ধারণ রয়েছে। প্রশ্ন হল দশমী বিদ্ধা না হওয়া সত্ত্বেও কেন এরূপ নির্ধারণ ? আবার অষ্ট মহাদ্বাদশীর জন্য যে যে নক্ষত্র প্রবৃত্তি হওয়া প্রয়োজন তাও ৫/৮/২০০৬ ইং অথবা ৬/৮/২০০৬ ইং তারিখে নেই। এমনকি কোন বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগও নেই (এই সম্পর্কে পরে আলোচনা করা যাবে)। কিন্তু মনে রাখতে হবে শ্রাবণ মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশীতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপন উৎসব করতে হয়। ঐদিন উপবাস থাকতে হয়। তাই শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের (১৫/১৬৭-২৩৪) অনুসরণে ভগবানকে ৬/৮/২০০৬ ইং রবিবার পবিত্র সূত্র পরিধান করাতে হয়। মনে হয় এর আলোকে ইস্কন রবিবার দিনই একাদশীর ব্রত নির্ধারন করেছে।

অষ্ট মহাদ্বাদশী নির্ণয়

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সূত গোস্বামী এবং শৌনক মুণির সংবাদে বলা হয়েছে-

উন্মিলনী বঞ্জুলীচ ত্রিস্পৃশা পক্ষবৰ্দ্ধিনী।
জয়াচ বিজয়াচৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী ॥
দ্বাদশ্যষ্টৌ মহাপুন্যাঃ সৰ্ব্বপাপহরা দ্বিজ।
তিথিযোগেন জায়ন্তে চতস্রশ্চপরা স্তথা ॥
নক্ষত্র যোগাচ্চ বলাৎ পাপং প্রশময়ন্তি তাঃ ॥

অর্থাৎ হে দ্বিজ! উন্মিলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃহা, পক্ষবর্ধিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী এবং পাপমোচনী- এই অষ্ট মহাদ্বাদশী মহাপূণ্য সম্পন্ন এবং নিখিল পাতকহারিণী। এই আটটির মধ্যে প্রথম চারটি তিথিযোগে এবং শেষ চারটি নক্ষত্রযোগে হয়। এই সব দ্বাদশী পাতক রাশি দূরীভূত করে।

উপরোক্ত আটটি দ্বাদশীতে উপবাস করতে হয়। এক্ষেত্রে আগের দিনে শুদ্ধা একদশী ত্যাগ করতে শাস্ত্রীয় কোন বাধা নেই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, পদ্মপুরান এবং স্কন্দ পুরান ইত্যাদিতে এই অষ্ট মহাদ্বাদশীর নিত্যতা এবং মাহাত্ম্য সর্ম্পকে অনেক কথা লিখিত আছে। যেমন ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরানে লিখিত আছে-

দ্বাদশ্যোহষ্টৌ সমাখ্যাতা যা পুরান বিচক্ষণৈঃ।
তাসামেকাপি চ হতা হন্তি পূণ্যঃ পুরাকৃতম্ ॥

অর্থাৎ পুরানবিদগণ যে অষ্ট মহাদ্বাদশীর কথা বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে একটি দ্বাদশীও যদি কেউ ত্যাগ করে তার পূর্বসঞ্চিত সব পূণ্য নষ্ট হয়।

পদ্মপুরানে শ্রী ভগবান বলেছেন-

ন করিষ্যন্তি যে লোকে দ্বাদশ্যোহষ্টৌ মমাজ্ঞয়া।
তেষাং যমপুরে বাসো যাবদাহুত সং প্লবম্ ॥

অর্থাৎ যে সব ব্যক্তি সংসারে এসে অষ্ট মহাদ্বাদশী ব্রত পালন না করে, আমার আদেশে তাকে প্রলয়কাল পর্যন্ত যমালয়ে বাস করতে হয়।

(চলবে)

যত নগরাদী গ্রামে

শ্রী প্রভুপাদের সমাধি মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্ত জগৎ গুরু শ্রীল প্রভুপাদ। প্রভুপাদের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য গত ১০ই আগস্ট, রোজ শুক্রবার চট্টগ্রাম হাটহাজারী মেঘল গ্রামে শ্রীল প্রভুপাদের মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হলো। ভোর ৪.১৫ মিঃ মঙ্গল আরতি, সকাল ৭.৩০ মিঃ শৃঙ্গার আরতি, সকাল ৮.০০ মিঃ গুরুপূজা, সকাল ৯.০০মিঃ ভাগবতপাঠ, ভাগবতপাঠ করেনঃ ঠাকুরগাঁও গড়েয়া মন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রী পুষ্পশীলা শ্যাম দাস ব্রহ্মচারী। সকাল- ১০.০০মিঃ বৈদিক হোমযজ্ঞ ও ভূমি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন- ঢাকা স্বামীবাগ ইসকন মন্দিরের প্রধান পূজারী শ্রী মাধব মুরারী দাস ব্রহ্মচারী। পরে যথাক্রমে ভোগ আরতি, মহাপ্রসাদ বিতরণ, আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের আলোচ্য বিষয় ছিল-

"বিশ্ব শান্তি স্থাপনে শ্রীল প্রভুপাদ"

সবচেয়ে আনন্দের সংবাদ যে, উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- ইসকনের অন্যতম গুরু ও জিবিসি শ্রীমৎ সুভগ স্বামী মহারাজ, শ্রীধাম-মায়াপুর-ভারত।

সভায় সভাপতিত্ব করেন- শ্রীশ্রী পুন্ডরীক বিদ্যানিধি স্মৃতি সংসদের সভাপতি- শ্রী মৃদুল কান্তি দে। শ্রীল প্রভুপাদের জীবনী নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন- শ্রী পতিত উদ্ধারণ দাস ব্রহ্মচারী, অন্যান্য আলোচক বৃন্দ শ্রী জগৎ গুরু গৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী লীলারাজ গৌর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী আরও অনেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা শেষে নাম সংকীর্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

● সংবাদদাতা- শ্রী পি ডি অভিষেক

ডাঃ দয়া রানী রায়ের পরলোকগমন

পঞ্চগড় জেলার বোদা থানার পৌরসভাধীন 'মা হোমিও হল' এর বিশিষ্ট মহিলা চিকিৎসক ডাঃ দয়া রাণী রায়(৪০) নিরাময় নার্সিং হোম বোদা, গল ব্লাডার স্টোন ভুল অপরেশনের ফলে রোগীর অবস্থা অবনতি হওয়ায় প্রথমে ঠাকুরগাঁও সিটি ক্লিনিক পরে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং পরবর্তীতে গত ০৪/১০/২০০৭ ইং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথেই বগুড়ার শেরপুরে পরলোক গমন করেন (দিব্যান লোকন্ স গচ্ছতু)। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। এ উপলক্ষে গত ১৫ অক্টোবর তার গ্রামের বাড়ীতে অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া সু-সম্পন্ন হয়। তিনি অসংখ্য গুনগ্রাহী এবং শুভাকাঙ্খীসহ স্বামী,দুই কন্যা ও এক ছেলেকে রেখে গেছেন। তার আত্মার শান্তি কামনায়

সংবাদদাতা- শ্রী রামারাজেন্দ্র দাসাধিকারী

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপযজ্ঞ প্রসঙ্গে

২০০৭

ঢাকার তুরাগ থানার ধউর গ্রাম শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দির ও হরেকৃষ্ণ নামহট্ট সংঘের (রেজি: ৪৪১/০৫) আয়োজনে গত ০৮/০৬/০৭ ইং তারিখে রোজ শুক্রবার হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপযজ্ঞ ৩য় পর্যায় ও তদুপলক্ষ্যে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই জপযজ্ঞের সার্বিক পরিচালনা ও পৌরহিত্যের দায়িত্ব পালন করে শ্রী প্রহ্লাদ কৃষ্ণ দাস, শ্রী শ্রী জগন্নাথ মন্দির (ইস্কন), নরসিংদী।

উক্ত অনুষ্ঠানে অসংখ্য ভক্ত প্রায় আড়াই ঘণ্টা একসাথে বসে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন অতঃপর জপকারী ভক্তদের নামে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠান দেখে স্থানীয় সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ভক্তরা উৎফুল্ল এবং আনন্দিত। উক্ত এলাকায় এই নিয়ে তৃতীয় বার হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপযজ্ঞের আয়োজন করা হয়। যজ্ঞের পর শুরু হয় আলোচনা সভা আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল নাম হচ্ছে যুগধর্ম, কলিযুগের একমাত্র সাধন পন্থা কি, এবং কেন? নাম কেন সর্বপাপনাশক, নামাভাসের সাতটি ফল, শ্রীকৃষ্ণ নামই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নাম সর্বপ্রকার জ্বালা, যন্ত্রণা, দুঃখ ও বেদনা থেকে মুক্তি প্রদান করে, জপ করুণ সবসময় সবখানে। এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন ইস্কন বাংলাদেশের সংকীর্তন প্রচার দলের দলনায়ক শ্রী নিতাই দয়াল দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রী প্রহ্লাদ কৃষ্ণ দাস। পরিশেষে সর্বজীবের মঙ্গল কামনায় এক বিশেষ প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র জপ যজ্ঞে ঢাকা, নরসিংদী, গাজীপুর, বিলাসপুর, ডুমনি, টঙ্গী, চেরাগআলি, বোর্ডবাজার, সাইনবোর্ড, ইছর, মজলিসপুর, স্কয়ার, কাশিমপুর, আশুলিয়া, রুস্তমপুর, সাইপারা, বিরুলিয়া, কোনাবাড়ি ও ভাদাম সহ বহু অঞ্চলের ভক্তবৃন্দের সমাগম হয়। উপস্থিত সকলকে কৃষ্ণপ্রসাদে আপ্যায়ন করানো হয় এবং প্যাকেটে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

- নিবেদক-শ্যামস্বরূপ দাস অধিকারী

শ্রীশ্রী রাধা-মাধব
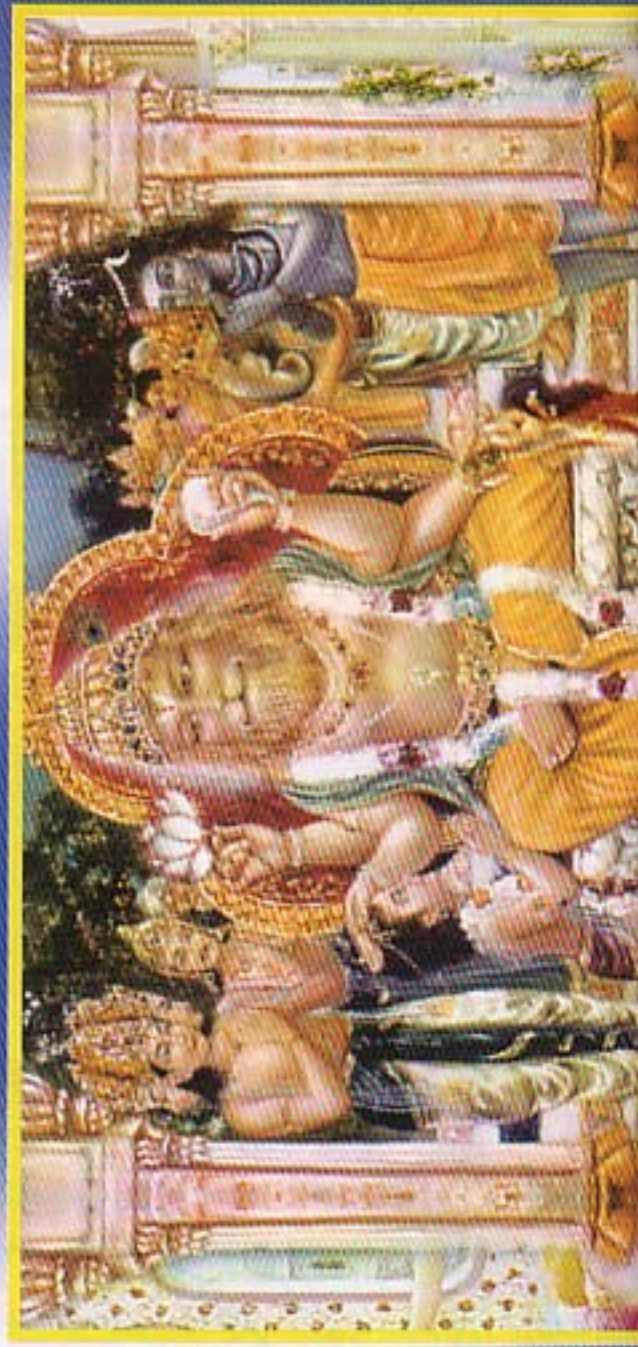
শ্রীশ্রী পঞ্চতত্ত্ব

শ্রীশ্রী নৃসিংহ দেব

শ্রীল এ.সি.ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী

শ্রীল ষড়গোস্বামী

Calendar-2008

January

S	S	M	T	W	T	F
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

February

S	S	M	T	W	T	F
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

March

S	S	M	T	W	T	F
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

April

S	S	M	T	W	T	F
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

May

S	S	M	T	W	T	F
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

June

S	S	M	T	W	T	F
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

July

S	S	M	T	W	T	F
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

August

S	S	M	T	W	T	F
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

September

S	S	M	T	W	T	F
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

October

S	S	M	T	W	T	F
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

November

S	S	M	T	W	T	F
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

December

S	S	M	T	W	T	F
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

❀ ইসকন মুখপত্র 'ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে' পত্রিকাটি পড়ুন এবং এর গ্রাহক হয়ে আপনার মানবজীবনকে ধন্য করুন। ❀
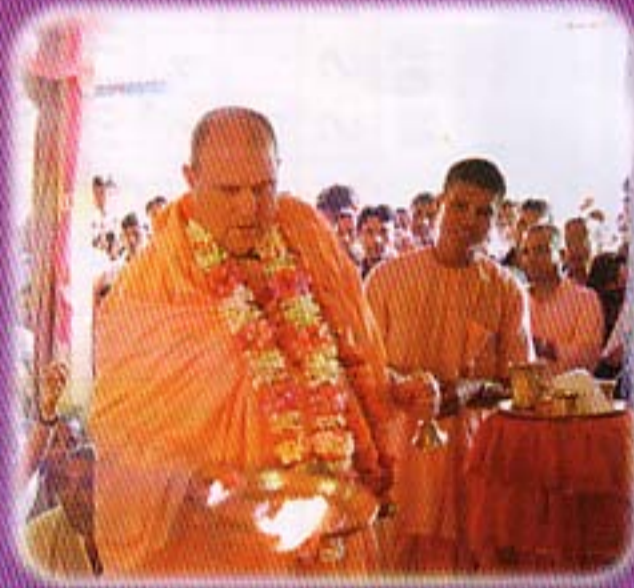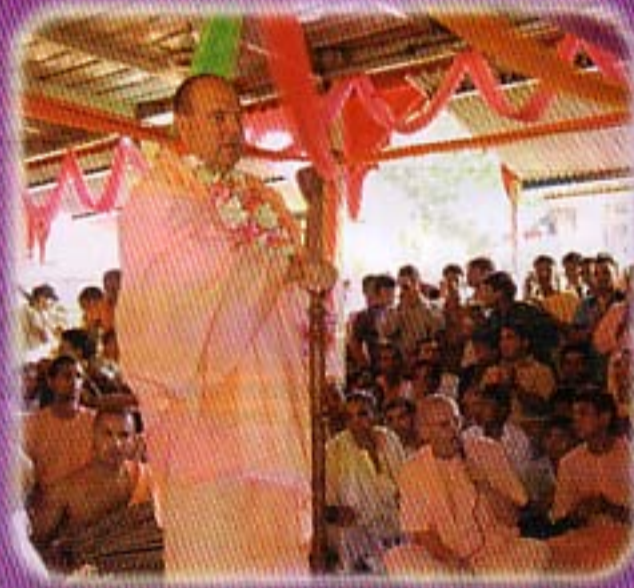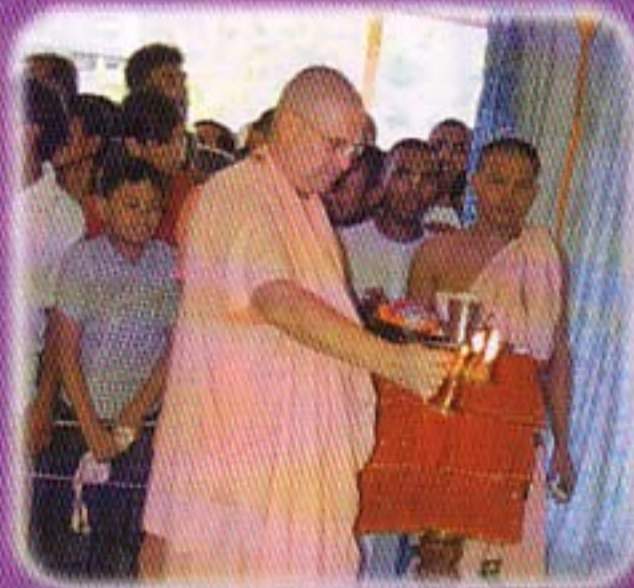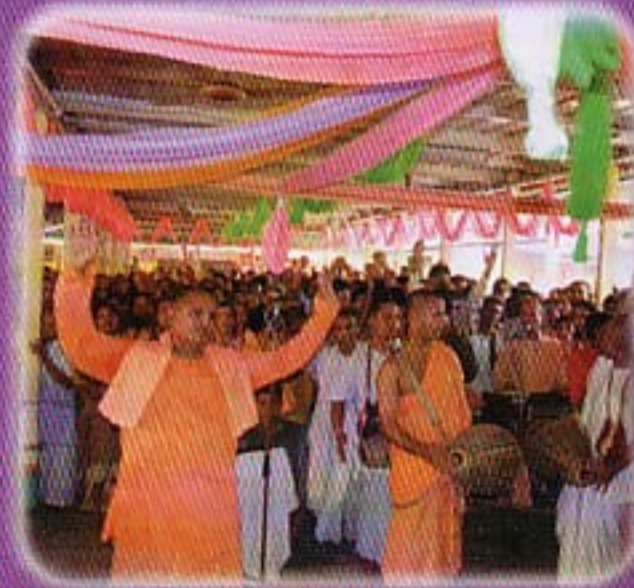
বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে

বর্ণ, বর্ণসঙ্কর ও বৈধ বিবাহ প্রসঙ্গ

-শ্রী অশ্বিনী কুমার সরকার

পূর্ব প্রকাশের পর **তৃতীয় পর্ব**

ওই সেমিনারে আলোচক হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন ফ্রান্স সফররত ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ব্রাহ্মণ বংশীয় শ্রী নরসীমা রাও। সেমিনারে রাও' এর আলোচনার বিষয় ছিল 'গান্ধী এন্ড দ্য গ্লোবাল ভিলেজ' কিন্তু নরসীমা রাও গান্ধীর নীতি ও দর্শনের ওপর আলোচনা শুরু করার পর হঠাৎ করে তাঁকে মাঝপথে চিৎকার দিয়ে থামিয়ে দিলেন সেমিনারে উপস্থিত এক ফরাসী মহিলা। তারপর তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও'কে উদ্দেশ্যে করে বলতে লাগলেন, " মাহাত্মা গান্ধীর নীতি ও দর্শন নিয়ে কথা বলার কোন অধিকার আপনার নেই। কারণ ভারতে এখনও মানুষের মাঝে জন্মগত উচ্চ-অনুচ্চ প্রাধান্য পায়। এখনও সেখানে বর্ণপ্রথা বিদ্যমান। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ছিলেন সকল অমানবিকতা ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে; উচ্চ-অনুচ্চের উর্ধ্বে। তাঁর নীতি ছিল- সকল মানুষ সমান, সকল মানুষ ভাই। অথচ গান্ধীর দেশে গান্ধীর নীতি ও দর্শন মান্য করা হয় না; আজও সেখানে বর্ণবৈষম্য রয়ে গেছে। তাই সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর গান্ধীর নীতি ও দর্শন নিয়ে কথা বলার কোন অধিকার নেই।" (তথ্যসূত্রঃ আজকের কাগজ, তাং ১৪.০৬.১৯৯৫) ভারতে সামাজিক স্তর বিভাজন ব্যবস্থা মানুষের স্বভাবজাত গুণ তথা যোগ্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে কি বিজ্ঞ ও সচেতন ফরাসী মহিলা প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও'র বিরুদ্ধে এভাবে প্রকাশ্যে আপত্তিকর ভাষায় প্রতিবাদ জানাতে পারতেন? এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সাম্প্রতিককালে ভারতের মুম্বাইতে (১৬-২১ জানুয়ারী ২০০৪) অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরাম আয়োজিত বিশ্বায়ন বিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের জাতপাত বিষয়টিও উত্থাপিত হয়। সম্মেলনে আলোচ্যসূচির ৫টি বিষয়ের মধ্যে বহু বছরের সামাজিক বংশানুক্রমিক জাতপাতভেদ প্রসঙ্গটিও স্থান পায়। বিষয়টি আলোচনায় স্থান পেতে প্রধান ভূমিকা পালন করেন ফোরামের মুখপাত্র শ্রী গৌতম মোদী। তিনি বলেন, "ভারতের ১৩ কোটি ৮০ লাখ সবচাইতে নীচু জাতের লোক দলিত শ্রেণীভুক্ত। এদের অচ্ছুত বলে গণ্য করা হয়। তারা ভারতের সবচাইতে নিপীড়িত, নিগৃহীত ও বঞ্চিত শ্রেণী এবং সমাজে তারা অচ্ছুত হিসেবে অভিহিত। এছাড়া ভারতে আরও ৬ কোটি ৮০ লাখ আদিবাসী রয়েছে। তারাও সমাজে একই রকম অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের শিকার।" নিউয়র্কের হিউম্যান রাইট্স ওয়াচের মতে, ভারতে প্রতি বছর দলিতদের বিরুদ্ধে হত্যা, ধর্ষণসহ ১ লক্ষ নির্যাতন নিপীড়নের ঘটনা ঘটে। এ ধরনের রিপোর্ট প্রকাশ সনাতন ধর্মাবলম্বী সমাজের জন্য সম্মানজনক কোন বার্তা বহন করে কিনা, তা গভীরভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক কনভেনসন স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রতিটি রাষ্ট্র যেখানে বর্ণবৈষম্যবাদ বিলোপের মাধ্যমে বিকাশের নীতি অনুসরণ করার ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সেখানে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা সংস্থার তা না মানার প্রশ্ন উঠে কীভাবে? আর মানবাধিকার খর্বকারী কোন নীতি বা দর্শন তো ধর্মের বিষয় বলে গণ্যই হতে পারে না। উল্লেখ্য, বেদ পুরাণ কিংবা গীতায়ও তার কোন সমর্থন নেই।

বৈধ বিবাহঃ যে বিবাহ পাত্র ও পাত্রী উভয় পক্ষের পূর্ণ সম্মতিতে নিয়ম মেনে এবং যথাযথ পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পন্ন হয়, সে বিবাহই বৈধ বিবাহ। বৈধ বিবাহের ফলে উদ্ভূত সন্তান কখনোই অবৈধ কিংবা অবাঞ্ছিত (বর্ণসঙ্কর) হিসাবে গণ্য করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রবীণ নেতা ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী তথাকথিত অসবর্ণ বিবাহের বিরোধিতা করতে গিয়ে তার প্রবন্ধে গীতার একটি শ্লোকেরও অপপ্রয়োগ করেছেন। তিনি তার বক্তব্যের পক্ষে গীতার শ্লোক ব্যবহার করলেও শ্লোকটি যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 'উক্তি' নয় তা কৌশলে এড়িয়ে গেছেন। তাছাড়া উক্তিটি কৃষ্ণভক্ত অর্জুন কর্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে সম্পূর্ণরূপে অবৈধ যৌনাচার তথা ব্যভিচারের মাধ্যমে সমাজে অবাঞ্ছিত সন্তান উৎপন্ন হওয়া প্রসঙ্গে; বৈধ বিবাহের ফলে উদ্ভূত সন্তান হওয়া প্রসঙ্গে নয়। এর কোন ব্যাখ্যা চক্রবর্তী মহাশয়ের বক্তব্যের মধ্যে নেই। কিন্তু কেন তা নেই? উল্লেখ্য, বিশেষ বিবাহ আইনে ভারত-বাংলাদেশে আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহ সম্পূর্ণরূপে বৈধ। ভারত সরকার এ ধরনের বিবাহ উৎসাহিত করার জন্য ৫০ হাজার রূপি অনুদান প্রদানের কথা ঘোষণা দিয়েছে (দ্রষ্টব্যঃ প্রথম আলো ১৬/০৯/০৬)। এর ফলে এ করতে কোন কোন স্থানে বৈদিক মত' পুনঃসম্পাদিতও হচ্ছে। ভারত-বাংলাদেশে এভাবে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। পত্রিকায় ক্রমবর্ধমান বিবাহের বিজ্ঞাপনের ভাষা (অসবর্ণে আপত্তি নেই উল্লেখ করা হলেও বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য তা হওয়া উচিত 'ভিন্ন সম্প্রদায়ে আপত্তি নেই), থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় কথা,

মানুষ নরকে গমন করে তার কৃতকর্ম বা পাপের ফলে; কিন্তু বৈধভাবে বিবাহ সম্পন্নকারীরা নরকে গমন করে– এমন প্রমাণ বেদ-গীতা-মহাভারতসহ কোন শাস্ত্র গ্রন্থে নেই। বৈধ বিবাহ প্রশ্নে আমার এ অভিমত কেবল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত ইস্‌কনের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে নয়; ১৯৭৫ সনের ৬ই এপ্রিল নারায়ণগঞ্জে বাংলাদেশ ভিত্তিক সনাতন ধর্ম সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব পাশ হয় তার সাথেও পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। পক্ষান্তরে ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তীর উল্লিখিত উক্তি সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সংহতি স্থাপনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সংহতি বিরোধী কোন তত্ত্ব কিংবা দর্শন ধর্ম বলে মোটেই গণ্য হতে পারে না। কিন্তু বাংলাদেশে জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতি সমাজ দর্পণ ও 'হিন্দু বিবাহ' গ্রন্থের মাধ্যমে তা-ই প্রচার করে চলেছেন। এতে কি প্রতিপন্ন হয় তিনি আদৌ সমাজ সংস্কারে বিশ্বাসী? বিকৃত ও অপব্যাখ্যাসম্বলিত গ্রন্থের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন ব্যতীত ধর্ম প্রচারের উপযোগী হবে কীভাবে– এ প্রশ্ন বলতে গেলে অধিকাংশ চিন্তাশীল ধর্মবিশ্বাসী মানুষের। ইস্‌কন কি সংস্কারের কাজ ছাড়াই বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রচারে নেমেছে।? ইস্‌কনের 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাষ্ট' নামে নিজস্ব

ইস্‌কনের গ্রন্থ প্রকাশনী সংস্থাঃ বিশ্বের সর্ববৃহৎ ধর্মগ্রন্থ প্রকাশনী সংস্থা বর্তমানে ইস্‌কনের 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাষ্ট' । এ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বলেছেন, " আমরা হাজার হাজার গ্রন্থ মুদ্রণ করব এবং সেগুলি একই গতিতে বিশ্বের সর্বত্র বিতরণ করব। তাহলে আমরা ইউরোপ ও আমেরিকায় এক বিরাট জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈদিক অধ্যাত্মবাদ বিস্তারে সমর্থ হব এবং এভাবে আমরা তাদেরকে প্রভাবিত করতে পারব। " আসলে প্রচারেই ধর্মদর্শনের প্রসার ঘটে। প্রচার ছাড়া এর প্রসারের কথা ভাবাই যায় না। ইস্‌কনের কৃষ্ণভক্তদের নিরলস চেষ্টার ফলে বৈদিক বর্ণবিভাজনের যুগোপযোগী ব্যাখ্যাসম্বলিত "শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ" গ্রন্থটি বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ভাষায় অনূদিত এবং বিক্রিত এজন্য 'দ্য গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস' এ স্থান করে নিয়েছে। (তথ্যসূত্রঃ হরেকৃষ্ণ সমাচার, আষাঢ়-১৪০০/১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা ও ভদ্র-১৪০০/২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা) কেবল বর্ণসঙ্কর ও বৈধ বিবাহের ব্যাপারে নয়; এ বিষয়টাও শান্তিপ্রিয় সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগণের জানা একান্ত প্রয়োজন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

(১৮ পৃষ্ঠার পর)

ছিলাম মার্সিলো লেবো, হলাম মরীচি দাস। দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা অর্চনায় পূজারীর ভূমিকা। দীর্ঘ আট বছর একুয়াদোরের নানা প্রান্তে কৃষ্ণসেবায় যুক্ত থাকি। ১৯৮৫ সালের জুন মাসে কোয়েমকা শহরের হরেকৃষ্ণ মন্দিরের প্রেসিডেন্ট পদের সেবা দায়িত্ব গ্রহণ করি। তিন বছর মন্দিরের অধ্যক্ষ সেবায় যুক্ত থাকার পর একুয়াদোরের সমস্ত মন্দিরের আইন-কানুন বিষয়ে এবং জন-সংযোগ সেবায় ভক্তিযোগ অনুশীলনে রত হই। ১৯৮৫ সালে গুয়াজাকিল শহরের হরেকৃষ্ণ মন্দিরের প্রেসিডেন্ট সেবা দায়িত্বে এগিয়ে আসি। এখানকার হরেকৃষ্ণ মন্দিরে বহু বহিরাগত পর্যটক ও দর্শনার্থীদের আগমন ও কৃষ্ণভাবনাময় উপলব্ধিকে আরও চমৎকৃত করতে সুস্বাদু কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজনালয় 'গোবিন্দ রেস্টুরেন্ট' খুলি। অল্পদিনের মধ্যেই দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে কৃষ্ণপ্রসাদের মাহাত্ম্য। যে ভারত দর্শনের আগ্রহে ঘর ছেড়েছি, স্বজন -পরিজন ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিয়েছি ,সেই পুণ্যভূমি ভারত তীর্থক্ষেত্র দর্শনে আসব,সেই দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা। ১৯৮৯ সালে ভারত ভূমিতে পদার্পণ করলাম শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে। শুরু থেকেই শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের সঙ্গে গোটা পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ পরিক্রমা এবং কৃষ্ণভাবনাময় প্রচারে যোগ দিই। ১৯৯০ সালে বাংলদেশে হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের বিভিন্ন সেবা সংকল্পে সামিল হই। ১৯৯১ সালে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করি ভারতে। বর্তমানে শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজের এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী হিসাবে কৃষ্ণভাবনাময় জীবনে যুক্ত রয়েছি। আমার সাধন ভজন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য - গুরুসেবা কৃষ্ণসেবা ।বিশ্বের তাবৎ দেশ ঘুরে দেখেছি হরেকৃষ্ণ আন্দোলন কৃষ্ণভাবনামৃতের দারুণ চাহিদা। গীতা-ভাগবত জ্ঞানের পরম বিজয় ঘটুক গোটা বিশ্বে।

বের হয়েছে! বের হয়েছে! বের হয়েছে!

সম্প্রতি বের হয়েছে বহুল আকাঙ্খিত চার বছরের অমৃতের সন্ধানে ১৬ সংখ্যা সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ বাঁধাই করা বই আকারে। বই এর সংখ্যা সীমিত, তাই সম্মানিত সকল এজেন্ট, গ্রাহক, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধায়ীদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে আপনার কাঙ্খিত কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

"কৃষ্ণ" আনন্দের আধার

এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ রচিত

KIRSHNA-THE RESERVOIR OF PLEASURE গ্রন্থ থেকে অনুদিত

অনুবাদক- মীনাক্ষী রাধিকা দেবী দাসী

অবশ্য নিউইয়র্কে কোনো শুকর দেখা যায় না। কিন্তু ভারতের গ্রামগুলোতে অনেক শুকর দেখা যায়। উহ! কি দুর্দশাপূর্ণই না তাদের জীবন! স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় বসবাস করে, মল-মূত্র খায়, সবসময় নোংরা, অপরিচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু শুকর মল-মূত্র খেয়ে, শুকরীর সাথে নিত্য যৌন কার্যে লিপ্ত হয়ে সে নিজেকে খুব সুখী মনে করে এবং দীর্ঘকায় হতে থাকে শুকর খুব মোটা হতে থাকে। কারণ তার মধ্যে আনন্দের যে উৎসাহটা থাকে সেটা হচ্ছে যৌনসুখ।

কিন্তু আমাদের শুকরের মতো হওয়া উচিত নয়, এই মিথ্যা ভাবনা ভেবে যে-আমরা সুখী। দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করার পর সামান্য একটু যৌন সুখ ভোগের পর আমরা মনে করি যে, এই উপায়েই আমরা খুব সুখে আছি। কিন্তু এটা প্রকৃত সুখ নয়। শ্রীমদ্‌ভাগবতমে এটাকে শুকরের সুখ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের সুখ হচ্ছে-যখন সে সত্ত্বগুণে অবস্থান করে। কেবল তখনই সে উপলব্ধি করতে পারে যে প্রকৃত সুখ কি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কার্যসূচীতে যদি আমরা কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করি, তাহলে এর ফলস্বরূপ আমাদের হৃদয়ের সকল ময়লা আবর্জনা যা আমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে সঞ্চয় করেছি তা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখব যে, আমরা আর রজোগুণ অথবা তমোগুণের মধ্যে নেই, আমরা সত্ত্বগুণে অবস্থান করছি। এই অবস্থানটা কি রকম?

আমরা জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে নিজেদেরকে আনন্দময় ও সুখী হিসেবে দেখতে পাব। আমরা কখনোই বিষন্নতা অনুভব করবো না। ভগবদ্‌গীতায় আমরা পাই যে এটা হচ্ছে আমাদের ব্রহ্মভূত (সত্ত্বগুণের সর্বোচ্চ পর্যায়) অবস্থা। বেদ আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমরা এই জড় বিষয় নই আমরা হচ্ছি ব্রহ্ম। অহম্‌ব্রহ্মাস্মি। শঙ্করাচার্য এই বেদবাক্য পৃথিবীতে প্রচার করে গেছেন। আমরা এই বিষয় নই, আমরা ব্রহ্ম, আত্মা।

যখন সত্যিকার অর্থে আমাদের পরমার্থ উপলব্ধি হবে, তখন আমাদের লক্ষণ বা আচার আচরণে পরিবর্তন ঘটবে। ঐসকল লক্ষণ গুলো কি কি? কেউ যখন তার পারমার্থিক উপলব্ধির স্তরে অবস্থান করে, তখন তার কোন আকাঙ্ক্ষা ও খেদোক্তি থাকবে না। খেদোক্তি বা বিলাপ হচ্ছে কোনো কিছু হারানোর জন্য দুঃখ প্রকাশ আর আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে কোনো কিছু পাওয়ার বাসনা করা।

এই জড় জগতে দু'টো চারিত্রিক অসুস্থতা রয়েছে। যা কিছু আমরা অধিকার করতে পারি না, আমরা তার জন্য আকাঙ্ক্ষা করি। যদি আমি এই জিনিষগুলো পেতাম, তাহলে আমি সুখী হতে পারতাম।

আমার টাকা নেই কিন্তু যদি আমি মিলিয়ন ডলার পেতাম তাহলে আমি সুখী হতে পারতাম। যখন আমাদের মিলিয়ন ডলার হলো কোনো কারণে সেটা হারিয়ে যায় তখন আমরা কাঁদবো, চিৎকার করব হায়! আমি সেটা হারিয়ে ফেলেছি। যখন আমরা আয় উপার্জনের জন্য আকাঙ্ক্ষা করি, তখন সেটা এক ধরনের চাপের সৃষ্টি করে। আমরা যখন কোনো কিছু হারিয়ে যাবার জন্য দুঃখ করি তখন সেটাও এক ধরনের চাপের সৃষ্টি করে থাকে কিন্তু যদি আমরা ব্রহ্ম ভূত স্তরে অবস্থান করি তাহলে আমরা হতাশও হবো না আকাঙ্ক্ষিতও হবো না। আমরা প্রত্যেক ব্যক্তি ও বস্তুকে সমানভাবে প্রত্যক্ষ করব। এমন কি যদি আমরা আগুনের মতো জ্বালাময় পরিস্থিতিতেও অবস্থান করি তবু আমরা বিরক্তি অনুভব করব না। এটাই হচ্ছে সত্ত্বগুণের ধরণ। ভাগবত অর্থ হচ্ছে ভগবানের বিজ্ঞান।

কেউ যদি এই ঐশ্বরিক বিজ্ঞানের প্রতি দৃঢ়নিষ্ঠ হয়, তবে সে ব্রহ্মভূত মর্যাদায় অবস্থান করবে। সেই ব্রহ্মভূত পর্যায় থেকে আমাদের কাজ করতে হবে, কাজ করার জন্য আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যতক্ষণ আমরা এই জড় দেহে থাকি ততক্ষণ আমাদের কর্ম করতেই হবে। আমরা কর্ম রহিত হতে পারব না; এটা সম্ভবও নয়। কিন্তু আমাদেরকে যোগের এই কৌশলটাকে অবলম্বন করতে হবে এবং এই উপায়ে এমনকি খুব সাধারণ কাজ করেও ভাগ্য অথবা কর্মফলের দ্বারাও আমরা সেই অবস্থায় প্রবেশ করতে পারি। ধরা যাক যে, কোনো ব্যক্তিকে তার পেশায় মিথ্যা কথা বলতে হয় অন্যথায় তার ব্যবসা চলে না। মিথ্যা খুব একটা ভালো জিনিস নয়। সুতরাং কেউ সিদ্ধান্ত দিতে পারে যে ব্যবসা নৈতিক আদর্শের উপর ভিত্তিশীল নয়, কাজেই সকলের উচিত এটা ত্যাগ করা কিন্তু ভগবদ্‌গীতায় আমরা এটা ত্যাগ না করার নির্দেশনা পাই। এমন কি যদি আমরা এমন কোনো পরিস্থিতিতে পতিত হই যে, কিছু অনৈতিক কাজ করলে আমাদের জীবন চলছে না তবুও আমাদের সেটা ত্যাগ করা উচিত নয়। (চলবে)

উপদেশে উপাখ্যান

গৃহমেদী

শান্তা জেতবনে তাপস নামে এক যুবক বাস করতো। তার মা একদিন বললেন বাছা পিতৃকুলের বংশরক্ষার জন্য তুমি সংসারী হও। যুবক বললো,' মা,বিবাহে আমার রুচি নেই। তোমার মৃত্যু হলে আমি সন্ন্যাস গ্রহন করব। মা বারবার ছেলেকে সংসারী হওয়ার জন্য অনুরোদ করতে লাগলেন। মায়ের আদেশ লঙ্ঘন করতে না পেরে বিবাহ করলেন। সন্ন্যাস নেবার সুবর্ণ সুযোগটি চলে যাওয়ায় যুবকের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

নুতন বৌ শ্বশুরবাড়ি এসে দেখল,স্বামী সব সময় মায়ের সেবা করছেন। তাই নুতন বৌ শাশুড়ীর খুবসেবা যত্ন করতে লাগল। এর ফলে যুবকও তার স্ত্রীর উপর খুব সন্তুষ্ট হল। সে স্ত্রীকে নানা রকম ভাল ভাল খাদ্য এবং উপহার দিতে লাগল। এত খাদ্য আর উপহার পেয়ে স্ত্রী খুব খুশি হয়ে গেল। সে ভাবল,'স্বামী তো ভাল ভাল জিনিস এনে কেবল আমাকেই দেন, মাকে যাতে কোন কিছু না দেয় তার ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে। ছেলেকে মায়ের উপর বিরূপ করে তোলার জন্য একটি কৌশলের আশ্রয় নিল। সে বাড়ির যেখানে সেখানে কফ, কাশি, থুথু ও পাকা চুল ফেলে রাখতো। যুবক একদিন জিজ্ঞাসা করল। 'ঘর দোর এরকম নোংরা কেন? কে নোংরা করেছে? বৌ বলল'আর কে? তোমার মা জননী।" যুবক বলল,'তুমি মাকে বারণ করতে পার না। বৌ বলল,' তুমি কি মনে কর যে, আমি বারণ করি না। 'ঘরদোর এরকম নোংরা করবেন না"- একথা বললে তোমার মা আমার সঙ্গে ঝগড়া করেন। তোমার মায়ের মত অলক্ষীর সঙ্গে আমি এক বাড়িতে থাকতে পারব না। হয় অলক্ষী মায়ের সেবা কর, না হয় আমাকে নিয়ে সংসার কর। আমরা দু'জনে কিছুতেই এক বাড়ীকে থাকতে পারব না।

সে মাকে বলল ,' মা, তুমি দেখছি রোজই ঝগড়া কর, ঘর দোর নোংরা করে রাখ। তুমি এ বাড়ি থেকে চলে যাও। যেখানে ইচ্ছা সেখানে গিয়ে থাক। এ কথা শুনে বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি থেকে চলে গেল।

হিতোপদেশ

সংসারে এরকম অনেক মা রয়েছে। তারা নিজ সুখের জন্য সন্তানকে বিবাহ দেন একটু আরাম আয়েশে থেকে বাকী দিনগুলো অতিবাহিত করবেন। কিন্তু তা আর হয়ে উঠে না, হিতে বিপরীত ফল ফলে। সন্তান হরিভজন করতে চাইলেও নানা অযুহাত দেখিয়ে সংসারে রাখার জন্য বিবাহ দেন। সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু। সেই ঘরে সুখের লেশ মাত্রও দেখা যায় না। তা অনলে পুড়িয়া যায়। সন্তান মদ, গাঁজা খায় খাক, কিন্তু যেন সন্যাসী হয়ে চলে না যায়। তার ব্যবস্থা করে শেষে নিজেকেই গৃহ থেকে বিতারিত হতে হয়।

নোঙর তোল

পুরনো দিনের কথা। শীতের রাত। কনকনে ঠাণ্ডা। জমিদার চৌধুরী বাবুর ছেলের বিয়ে। কলকাতার শোভাবাজারের ঘাটে নৌকা সাজানো রয়েছে। নৌকা করে বরযাত্রী যাবে শান্তিপুর। চৌধুরীবাবু মাঝিকে নির্দেশ দিলেন বিবাহের নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে শান্তিপুরে পৌঁছতে। অতিশয় ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন হিমেল রাত। সব বরযাত্রী হৈচৈ করে নৌকার ভেতরে ঢুকে বসল। কপাট বন্ধ করল। বসে বসে তারা একে একে ঘুম চোখে ঢুলতে লাগল। সারা রাত জেগে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে দাঁড় বেয়ে চলল।

ক্রমে রাত শেষ হয়ে আসে। ভোরের কুয়াশা একটু পরিষ্কার হতে থাকে। সেই সময় মাঝি আর দাঁড়িদের মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া শুরু হয়। চেঁচামেচি শুনে চৌধুরীবাবু ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু কাকে কি বলবেন? বরযাত্রীরা কেউ কেউ বাইরের দিকে চোখ মেলেই একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়ল। চৌধুরীবাবু বললেন, "এ কি! সেই শোভাবাজারেই ! নৌকা একটুও নড়েনি! সারারাত একটা জায়গায় পড়ে আছে! এ স্বপ্ন, না সত্যি?"

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে চোখ রাঙিয়ে চৌধুরীবাবু মাঝিকে তীব্র ভাষায় গালি দিতে লাগলেন। ক্লান্ত মাঝি কান্নাকাটি করে বলতে লাগল, "সারা রাত আমি একটুও বিরাম নিইনি। ওরাও দাঁড় বেয়েছে। তবুও নৌকা যেখানেই ছিল, সেইখানেই রয়েছে। এ কি যাদু হলো আমিও বুঝতে পারছি না।" তখন বরযাত্রীদের মধ্যে এক বয়স্ক ব্যক্তি বললেন, "দেখ নোঙরটা তুলেছ কি না?"

মাঝি দেখল সত্যিই তাই। নোঙর তোলা হয়নি। এরূপ নির্বুদ্ধিতার জন্য মাঝি শাস্তির ভয়ে মাথা চাপড়িয়ে কাঁদতে লাগল। এরকম মস্ত বড় ভুল সে করে রেখেছে। এখন, দশা কি হবে? এদিকে নির্দিষ্ট দিনে শুভ লগ্নে বিবাহের আর আশা নেই। বহু অর্থ নষ্ট। বহু উদ্যোগ নষ্ট। কন্যাপক্ষের লোকেরা বহুজনের কাছে নিতান্তই অপ্রস্তুত হল। সমস্ত কাজই লণ্ডভণ্ড হল। বরের পিতাও অতিশয় মর্মাহত হলেন। সমস্ত ব্যবস্থাপনাই পণ্ড হল।

হিতোপদেশ

নোঙর ফেলে রেখে নৌকা চালানোর যাবতীয় চেষ্টা যেমন বৃথা হয়, তেমনি জড়জাগতিক ভোগ বাসনায় মন রেখে হাজার ভজন-সাধন করলে সবই পণ্ড হবে। কোন কালেই ভব-নদী পেরিয়ে শান্তিপুরের কৃষ্ণসেবার রাজ্যে পৌছানো যাবে না। অকালে দুর্লভ মানব জীবন নষ্ট হয়ে যায়। তাই জড় আসক্তি–নোঙর গুটিয়ে নিতে হবে।

আদর্শ গৃহস্থ জীবন লাভের উপায়

এই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের নামহট্ট বিভাগ আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছে
কিভাবে গৃহে থেকে আদর্শ গৃহস্থ জীবন লাভ করতে পারেন

গৃহস্থের অর্থনীতি

গৃহস্থকে যথাসম্ভব বেশি পরিমাণে অর্থ উপার্জন করতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে, কৃষি-গোপালনের মাধ্যমে-শাস্ত্রসম্মত বিভিন্ন পন্থায় তিনি সৎভাবে অর্থ উপার্জন করবেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর অনেক শিষ্যকে কোটিপতি হতে উৎসাহিত করেছেন।

প্রশ্ন হল, কৃষ্ণভাবনার পন্থা যেখানে সরল জীবন উচ্চভাবনা, সেখানে শ্রীল প্রভুপাদের মতো একজন শুদ্ধ ভক্ত কেন তাঁর গৃহস্থ শিষ্যদের কোটিপতি হতে উৎসাহিত করেছেন? তার উত্তরও তিনি দিয়েছেন। গৃহস্থ তাঁর উপার্জিত অর্থের ৫০% কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য, অবশিষ্ট ৫০%-এর সাহায্যে সংসারের দৈনন্দিন ব্যয়ভার বহন করবেন।

কোনও গৃহস্থ হয়তো ভাবতে পারেন, ঠিক আছে, আমি ৫০% শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যয় করব, তবে আমার নিজের বাড়িতেই আমি কৃষ্ণের জন্য ফ্রিজ কিনব, মন্দির করব, মঠে মন্দিরে দান করার কোনো দরকার নেই।

এরকম ভাবনায় আত্মপ্রতারণার সম্ভাবনা রয়েছে। নিজের বাড়িতে কৃষ্ণসেবার দোহাই দিয়ে প্রকারান্তরে সমস্ত টাকাই কুটুম্বভরণে ব্যয় করা উচিত নয়। বরং কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে নিযুক্ত গুরুমহারাজকে কিংবা পরম্পরাযুক্ত কোন শুদ্ধ ভক্তকে সেই অর্থ দান করুন, কেননা তিনি সেই টাকাটা শুধু কৃষ্ণের জন্যই আরও নিখুঁতভাবে সেবায় লাগাবেন। পাশাপাশি কুটুম্ব ভরণের জন্য নির্ধারিত ২৫% টাকাটা দিয়ে আপনার ঘরেও শ্রীকৃষ্ণসেবা করতে পারেন।

এখন প্রশ্ন হল, যে সমস্ত গৃহস্থরা সব সময় কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের মন্দিরে থেকে কৃষ্ণসেবা করছেন, তাঁরা তো ব্যবসা-বাণিজ্য করার পর্যাপ্ত সময় পাবেন না। তাঁদের পক্ষে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে মন্দিরকে দান করা তো অনেক সময় সম্ভব হয় না, বরং তাঁদের ভরণ পোষণের জন্যও মন্দিরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়।

এই ব্যাপারে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশ হল, মঠবাসী গৃহস্থেরা যাঁরা সবসময় কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত, তাঁরা যেন যথাসম্ভব অল্পে সন্তুষ্ট থাকেন।

বিবাহ-বিচ্ছেদ অবৈদিক

কৃষ্ণভাবনাময় বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। শ্রীল প্রভুপাদ তাই একবার নিয়ম করেছিলেন যে, বিবাহে ইচ্ছুক ভক্তরা যেন বিবাহের আগেই একটি কাগজে লিখিতভাবে প্রতিজ্ঞা করেন যে, কোন অবস্থাতেই তাঁরা বিবাহ-বিচ্ছেদ হতে দেবেন না। সেই প্রতিজ্ঞাকে গুরুত্ব দিতে হবে। গুরুদেব,বৈষ্ণব, অগ্নি এবং বিগ্রহকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা গ্রহণের বিধি বৈদিক শাস্ত্রেও রয়েছে। এই প্রতিজ্ঞা কোনো ছেলেখেলা নয়।

কৃষ্ণভাবনায় যথেষ্ট বলিষ্ট না হলে,গৃহস্থ জীবনেও মায়া প্রবেশ করে জীবনকে অত্যন্ত দুঃখময় করে তুলবেই। তাই,কৃষ্ণভাবনাতে গৃহস্থকেও সন্ন্যাসীর মতোই দৃঢ়ব্রত হতে হবে এবং কেবল তা হলেই গৃহস্থ-জীবন সুখময় হতে পারে। অব্যর্থভাবে কমপক্ষে ১৬ মালা জপ করা, শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ পড়া,নগর সংকীর্তন এবং গ্রন্থ বিতরণ ইত্যাদি সেবা করার মাধ্যমে কৃষ্ণসেবায় দৃঢ়ব্রত হওয়া যায়। যে গৃহস্থ কৃষ্ণসেবায় দৃঢ়ব্রত নয়,যে কোন মুহূর্তে সেই গৃহস্থের জীবনে অশান্তির বিষ নেমে আসবে।

শ্রীল প্রভুপাদ এই বিবাহকে এক প্রকার কনসেশন বা অতিরিক্ত সুযোগ কিংবা আপস নিষ্পত্তি বলেই গণ্য করতেন কেননা,ব্রহ্মচর্যই কৃষ্ণভাবনার পক্ষে উৎকৃষ্ট আশ্রম। ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমে বীর্য সঞ্চিত হলে স্মৃতি প্রখর হয় এবং শ্রবণ কীর্তনাদি পন্থার যথার্থ ফল লাভ করা যায়। বর্তমানে বেশির ভাগ যুবক যুবতী কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনে অক্ষম বলেই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর শিষ্যদের এই কনসেশন দিয়েছেন। সুতরাং এই কনসেশন বা আপস নিষ্পত্তিকে শোষণ করে তার অপব্যবহার করার থেকে অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে?

কান্ডজ্ঞানহীনের মতো বিবাহ-বিচ্ছেদ,গৃহস্থ আশ্রমের দায়িত্বকে অস্বীকার করা-এসব ঘটনা তো ছোটলোকের জীবনে হামেশাই হচ্ছে। বৈষ্ণবরাই হচ্ছেন জগতের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। কিন্তু আপনার ব্যবহারই আপনার পরিচয়। তাই ছোটলোক নয়,ভদ্রলোকের আচরণই বাঞ্ছনীয়।

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবত হলো প্রাচীন ভারতের বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের সারাতিসার। পাঁচ হাজার বছর আগে মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস পারমার্থিক জ্ঞানের সারভাগ ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে এই অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। এখানে মূল সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রদত্ত শব্দার্থ, অনুবাদ এবং তাৎপর্য উপস্থাপন করা হলো। এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করা হচ্ছে-

প্রথম স্কন্ধ : "সৃষ্টি"

(পূর্ব প্রকাশের পর)

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্লোক-২৪

মতির্ময়ি নিবদ্ধেয়ং ন বিপদ্যেত কর্হিচিৎ ।
প্রজাসর্গনিরোধেহপি স্মৃতিশ্চ মদনুগ্রহাৎ ॥২৪॥

মতিঃ-মতি; ময়ি-আমার প্রতি ভক্তি পরায়ণ; নিবদ্ধা-নিবদ্ধ; ইয়ম্-এইভাবে; ন-কখনই নয়; বিপদ্যেত-পৃথক্; কর্হিচিৎ-যে কোনও সময়ে; প্রজা-জীব; সর্গ-সৃষ্টির সময়; নিরোধে-প্রলয়ের সময়েও; অপি-এমন কি; স্মৃতিঃ-স্মৃতি; চ-এবং; মৎ-আমার; অনুগ্রহাৎ-অনুগ্রহের প্রভাবে।

অনুবাদ

আমার সেবায় নিবদ্ধ বুদ্ধি কখনই প্রতিহত হতে পারে না। সৃষ্টির সময় এমন কি প্রলয়ের সময়েও আমার কৃপায় তোমার স্মৃতি অপ্রতিহত থাকবে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবা কখনই বিফল হয় না। পরমেশ্বর ভগবান যেহেতু নিত্য, তাই মতি বা বুদ্ধি যখন তাঁর সেবায় যুক্ত হয় অথবা কোন কিছু যখন তাঁর উদ্দেশ্যে সাধিত হয় তখন তাও নিত্যত্ব প্রাপ্ত হয়। ভগবদ্গীতাতে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা জন্ম-জন্মান্তরে সঞ্চিত হতে থাকে এবং ভক্ত যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হন তখন তার জন্মজন্মান্তরে সমস্ত সেবা স্মরণ করে ভগবান তাঁকে তার চিন্ময় ধামে তাঁর পার্ষদত্ব করেন। ভগবানের প্রতি সম্পাদিত সেবা কখনই বিনষ্ট হয় না,পক্ষান্তরে পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্যন্ত তা ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হতে থাকে।

শ্লোক-২৫

এতাবদুক্ত্বোপররাম তন্মহদ্
ভূতং নভোলিঙ্গমলিঙ্গমীশ্বরম্ ।
অহং চ তস্মৈ মহতাং মহীয়সে
শীর্ষ্ণাবনামং বিদধেহনুকম্পিতঃ ॥২৫॥

এতাবৎ-এইভাবে; উক্তা-উক্ত; উপররাম-প্রতিহত হয়ে; তৎ-তা; মহৎ-মহান; ভূতম-অদ্ভুত; নভঃ-লিঙ্গম্-শব্দরূপে প্রকাশিত; অলিঙ্গম্-চক্ষুর দ্বারা দৃশ্যমান নন; ঈশ্বরম-পরম নিয়ন্তা; অহম-আমি; চ-ও; তস্মৈ-তাঁকে মহতাম্-মহৎ; মহীয়সে-মহিমা-মণ্ডিত; শীর্ষ্ণা-মস্তক দ্বারা; অবনামম্- প্রণতি; বিদধে-করেছিলাম; অনুকম্পিতঃ-তাঁর দ্বারা অনুকম্পিত হয়ে।

অনুবাদ

তারপর সেই পরম ঈশ্বর, যিনি শব্দের দ্বারা প্রকাশিত এবং চক্ষুর দ্বারা অদৃশ্য, কিন্তু পরম অদ্ভুত, তাঁর বাণী শেষ করলেন। গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করে আমি নত মস্তকে তাঁকে আমার প্রণতি নিবেদন করেছিলাম।

তাৎপর্য

সেই পরমেশ্বর ভগবানকে যে দেখা যায়নি, কেবল তাঁর বাণী শোনা গিয়েছিল, তার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পরমেশ্বর, ভগবান তাঁর নিঃশ্বাসের মাধ্যমে বেদ সৃষ্টি করেছিলেন। বেদের অপ্রাকৃত শব্দের মাধ্যমে তাঁকে দর্শন করা যায় এবং উপলব্ধি করা যায়। তেমনই, ভগবদ্গীতা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শব্দরূপ প্রকাশ এবং তাই তাঁর থেকে তা অভিন্ন। অর্থাৎ, নিরন্তর অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ সমন্বিত ভগবানের নাম কীর্তন করার ফলে তাঁকে দর্শন করা যায় এবং শ্রবণ করা যায়।

শ্লোক-২৬

নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্
গুহ্যানি ভদ্রানি কৃতানি চ স্মরন্ ।
গাং পর্যটংস্তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ
কালং প্রতীক্ষন্ বিমদো বিমৎসরঃ ॥২৬॥

নামানি-ভগবানের দিব্য নাম, মহিমা ইত্যাদি; অনন্তস্য-অনন্তের; হতত্রপঃ-জড় জগতের সব রকমের রীতি-নীতি থেকে মুক্ত হয়ে; পঠন-পুনঃ পুনঃ পাঠ করা, আবৃত্তি করা ইত্যাদি; গুহ্যানি-গোপনীয়; ভদ্রানি-সমস্ত আশীর্বাদ কৃতানি-কার্যকলাপ; চ-এবং স্মরণ-নিরন্তর স্মরণ করা; গাম্-পৃথিবীতে; পর্যটন-পর্যটন; তুষ্টমনাঃ- সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত; গতস্পৃহঃ-সব রকমের

জড় কামনা বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে; কালম্-কাল; প্রতীক্ষন-প্রতীক্ষা; বিমদঃ-গর্বিত না হয়ে; বিমৎসরঃ-নির্মৎসর।

অনুবাদ

এইভাবে সব রকম সামাজিক লৌকিকতা উপেক্ষা করে আমি ভগবানের দিব্য নাম এবং মহিমা নিরন্তর কীর্তন করতে শুরু করি। ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা এইভাবে কীর্তন এবং স্মরণ অত্যন্ত মঙ্গলজনক। এইভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে আমি সর্বতোভাবে তৃপ্ত হয়ে অত্যন্ত বিনীত এবং নির্মৎসর চিত্তে সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করতে থাকি।

তাৎপর্য

নারদ মুনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তের জীবন সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন। এই ধরনের ভক্ত ভগবান অথবা তাঁর আদর্শ প্রতিনিধির কাছ থেকে দীক্ষালাভ করার পর অত্যন্ত ঐকান্তিকভাবে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করে ভগবানের মহিমা প্রচার করেন, যাতে অন্যেরাও ভগবানের মহিমা শ্রবণ করতে পারে। এই ধরনের ভক্তদের কোন রকম জাগতিক লাভের কোনও বাসনা থাকে না। তাঁরা কেবল একটিমাত্র বাসনার দ্বারাই অনুপ্রাণিত- ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া, এবং যথাসময়ে তাঁরা তাঁদের জড় দেহটি ত্যাগ করে ভগবানের কাছে ফিরে যান। ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়াই হচ্ছে তাঁদের চরম উদ্দেশ্য। তাই তাঁরা কারোর প্রতি কখনও ঈর্ষাপরায়ণ হন না এবং ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন বলে তাঁরা কোন রকম গর্ব অনুভব করেন না। তাঁদের একমাত্র কাজ হচ্ছে ভগবানের নাম মহিমা এবং লীলা কীর্তন করা ও স্মরণ করা। তা তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে করেন এবং কোন রকম জাগতিক লাভের আশা না নিয়ে অন্যের মঙ্গল সাধন করার জন্য সেই বাণী বিতরণ করেন।

শ্লোক-২৭

এবং কৃষ্ণমতের্ব্রহ্মন্নাসক্তস্যামলাত্মনঃ।
কালঃ প্রাদুরভূৎকালে তড়িৎসৌদামনী যথা ॥ ২৭॥

এবম্-এইভাবে; কৃষ্ণমতেঃ-যিনি সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন; ব্রহ্মন্-হে ব্যাসদেব; ন-না; আসক্তস্য-আসক্ত; অমলাত্মনঃ-যিনি সর্বতোভাবে সব রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত; কালঃ-মৃত্যু; প্রাদুরভূৎ-প্রাদুর্ভূত হয়েছিল; কালে-যথাসময়ে; তড়িৎ-বিদ্যুৎ; সৌদামনী-আলোক; যথা-যেমন।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ ব্যাসদেব, আমি যখন শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়েছিলাম, তখন আমার আর কোন আসক্তি ছিল না। সব রকমের জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে আমার মৃত্যু হয়েছিল ঠিক যেভাবে তড়িৎ এবং আলোক যুগপৎভাবে দেখা যায়।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় সর্বতোভাবে মগ্ন হওয়ার অর্থ হচ্ছে সব রকম জড় কলুষ অথবা জড় আকাঙ্খা থেকে মুক্ত হওয়া। অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী মানুষের যেমন ছোটখাটো জিনিষের প্রতি আকাঙ্খা থাকে না, তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, যাঁরা ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়ে সচ্চিদানন্দময় জীবন লাভ অবশ্যম্ভাবী, তাঁর স্বভাবতই অনিত্য, অলীক এবং অর্থহীন জড় বিষয়ের প্রতি আর কোন আসক্তি থাকে না। সেটিই হচ্ছে পারমার্থিক চেতনায় উন্নত ভক্তের লক্ষণ। তারপর শুদ্ধ ভক্ত যখন সর্বতোভাবে প্রস্তুত হন, তখন হঠাৎ দেহের পরিবর্তন ঘটে, যাকে সাধারণত বলা হয় মৃত্যু। বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে যেমন আলোকের প্রকাশ হয়, ঠিক তেমনই শুদ্ধ ভক্তের জড় দেহ ত্যাগ এবং চিন্ময় দেহ লাভ ভগবানের ইচ্ছায় প্রভাবে একই সঙ্গে হয়ে থাকে। মৃত্যুর পূর্বেও শুদ্ধ ভক্তের কোন রকম জড় আসক্তি থাকে না। আগুনের সংস্পর্শে লোহাও যেমন গরম হয়ে আগুনের গুণ প্রাপ্ত হয়, ঠিক তেমনই শুদ্ধ ভক্তের জাগতিক শরীরও চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক-২৮

প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
আরব্ধকর্মনির্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ ॥ ২৮॥

প্রযুজ্যমানে-লাভ করে; ময়ি-আমাকে; তাম্-তা; শুদ্ধাম্-বিশুদ্ধ; ভাগবতীম্-পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ করার উপযুক্ত; তনুম্-দেহ; আরব্ধ-সঞ্চিত; কর্ম-সকাম কর্ম; নির্বাণঃ-নিবৃত্ত করা; ন্যপতৎ-ত্যাগ করা; পাঞ্চভৌতিকঃ-পঞ্চভৌতিক দেহ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ করার উপযুক্ত একটি চিন্ময় শরীর লাভ করে আমি পঞ্চভৌতিক দেহটি ত্যাগ করি, এবং তার ফলে আমার সমস্ত কর্মফল নিবৃত্ত হয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের কাছ নারদ মুনি প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন যে তাঁর সঙ্গে সঙ্গ করার উপযুক্ত শরীর তিনি পাবেন, এবং প্রতিশ্রুতি অনুসারে নারদ মুনি তাঁর

জাগতিক দেহটি ত্যাগ করা মাত্রই তাঁর চিন্ময় শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই চিন্ময় শরীর সব রকম জড় প্রভাব থেকে মুক্ত এবং তা তিনটি প্রধান চিন্ময় গুণের দ্বারা ভূষিত, যথা নিত্যত্ব,জড় গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত এবং সকাম কর্মের ফল থেকে মুক্ত। জড় শরীর সর্বদাই এই তিনটি গুণের অভাবে দুর্দশাগ্রস্ত। ভক্ত যখন ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত হন, তৎক্ষণাৎ তাঁর দেহ চিন্ময় গুণাবলীর দ্বারা সম্পৃক্ত হয়। এটি অনেকটা লোহার উপর চিন্তামণির স্পর্শের প্রভাবের মতো। চিন্তামণির স্পর্শে লোহা যেমন সোনা হয়ে যায়, ভগবদ্ভক্তির চিন্ময় প্রভাবে জীবও তেমন চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। তাই দেহত্যাগ মানে হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের উপর জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাব স্তব্ধ হওয়া। এই সম্পর্কে শাস্ত্রে বহু নিদর্শন রয়েছে। ধ্রুব মহারাজ, প্রহ্লাদ মহারাজ, আদি বহু ভক্ত তাঁদের সেই শরীরেই পরমেশ্বর ভগবানকে দেখতে সমর্থ হয়েছিলেন। তার অর্থ হচ্ছে যে তখন সেই ভক্তদের দেহ জড় থেকে চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। সেটিই হচ্ছে প্রামাণিক শাস্ত্রের মাধ্যমে তত্ত্বদ্রষ্টা গোস্বামীদের সিদ্ধান্ত। ব্রহ্ম-সংহিতায় বলা হয়েছে যে, ইন্দ্রগোপ থেকে শুরু করে দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত সমস্ত জীব কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ এবং তাদের কর্ম অনুসারে তারা সুখভোগ করে অথবা দুঃখভোগ করে। ভক্তরাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে সেই প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত।

শ্লোক-২৯

কল্পান্ত ইদমাদায় শয়ানেহম্ভস্যুদম্বতঃ।
শিশয়িষোরনুপ্রাণং বিবিশেহন্তরহং বিভোঃ॥২৯॥

কল্পান্ত–প্রতিটি কল্পের শেষে; ইদম্–এই; আদায়–সংগ্রহ করে; শয়ানে–শয়ন করে; অম্ভসি–কারণ বারিতে; উদন্বতঃ–প্রলয়; শিশয়িষোঃ–পরমেশ্বর ভগবানের (নারায়ণের) শয়ন; অনুপ্রাণম্–নিঃশ্বাস; বিবিশে–প্রবেশ করে; অন্ত–অন্তরে; অহম্–আমি; বিভোঃ–ব্রহ্মার।

অনুবাদ

কল্পান্তে যখন পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ কারণ বারিতে শয়ন করলেন, ব্রহ্মা তখন সৃষ্টির সমস্ত উপাদানগুলি নিয়ে তাঁর মধ্যে প্রবেশ করলেন, এবং আমিও তখন তাঁর নিঃশ্বাসের মাধ্যমে তাঁর মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম।

তাৎপর্য

নারদ মুনি ব্রহ্মার পুত্ররূপেই পরিচিত, ঠিক যেমন শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পুত্ররূপে পরিচিত। পরমেশ্বর ভগবান এবং নারদ মুনির মতো তাঁর নিত্যমুক্ত ভক্তরা একইভাবে জড় জগতে আবির্ভূত হন। ভগবদগীতায় বলা হয়েছে যে, ভগবানের জন্ম এবং কর্ম দিব্য। তাই আচার্যদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রহ্মার পুত্ররূপে নারদ মুনির আবির্ভাবও একটি দিব্য লীলা। তাঁর আবির্ভাব এবং তিরোভাব ভগবানের আবির্ভাব এবং তিরোভাবেরই সমপর্যায়ভুক্ত। তাই ভগবান এবং তাঁর ভক্তরা একই সঙ্গে ভিন্ন এবং অভিন্ন। তাঁরা উভয়েই একই চিন্ময় স্তরের অন্তর্গত।

শ্লোক-৩০

সহস্রযুগপর্যন্তে উত্থায়েদং সিসৃক্ষতঃ।
মরীচিমিশ্রা ঋষয়ঃ প্রাণেভ্যোহহং চ জজ্ঞিরে॥ ৩০॥

সহস্র-এক হাজার; যুগ–তেতাল্লিশ লক্ষ বছর; পর্যন্তে–সেই স্থায়িত্বের পর; উত্থায়–মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে; ইদম্– এই; সিসৃক্ষতঃ–পুনরায় সৃষ্টি করার বাসনা; মরীচি-মিশ্রাঃ–মরীচি আদি ঋষিরা; ঋষয়ঃ–সমস্ত ঋষিরা; প্রাণেভ্যঃ–তাঁর ইন্দ্রিয় থেকে;অহম্–আমি; চ–ও; জজ্ঞিরে–আবির্ভূত হয়েছিলাম।

অনুবাদ

৪৩০,০০,০০,০০০ সৌর বৎসরের পর ব্রহ্মা যখন ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে পুনরায় সৃষ্টি করার জন্য মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি আদি ঋষিদের তাঁর দিব্য দেহ থেকে সৃষ্টি করেন, তখন তাঁদের সঙ্গে আমিও আবির্ভূত হয়েছিলাম।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার একটি দিন হচ্ছে ৪৩২,০০,০০,০০০ সৌর বৎসর। সে কথা ভগবদ্গীতাতে বলা হয়েছে। সেই হিসাবে তাঁর রাত্রিও ৪৩২,০০,০০,০০০ সৌর বৎসর। ভগবদ্গীতাতে সে কথাও বলা হয়েছে। তাই সেই সময়ে ব্রহ্মা তাঁর স্রষ্টা গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর শরীরে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত থাকেন। এই ভাবে নিদ্রিত অবস্থা থেকে জেগে উঠে ব্রহ্মা ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে পুনরায় সৃষ্টি শুরু করেন; তখন ভগবানের অপ্রাকৃত শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে সমস্ত মহর্ষিরা আবার আবির্ভূত হন এবং নারদ মুনিও তখন আবির্ভূত হন। অর্থাৎ নারদ মুনি তাঁর একই চিন্ময় শরীর নিয়ে আবির্ভূত হন, ঠিক যেমন মানুষ সেই একই শরীরে জেগে ওঠে। নারদ মুনি সর্বশক্তিমান ভগবানের জড় সৃষ্টিতে এবং চিন্ময় জগতের যে কোনও জায়গায় বিচরণ করতে পারেন। তিনি তাঁর চিন্ময় শরীরে আবির্ভূত হন এবং অন্তর্হিত হন। তাঁর সেই শরীরে

দেহ এবং আত্মার কোন পার্থক্য নেই, যা বদ্ধ জীবের মধ্যে দেখা যায়।

শ্লোক-৩১

অন্তর্বহিশ্চ লোকাংস্ত্রীন্ পর্যেম্যস্কন্দিতব্রতঃ।
অনুগ্রহান্মহাবিষ্ণোরবিঘাতগতিঃ ক্বচিৎ ॥ ৩১॥

অন্তঃ-চিন্ময় জগতে; বহিঃ-জড় জগতে; চ-এবং; লোকান্-ত্রিন্-ত্রিভুবন; পর্যেমি-পর্যটন করেছি; অস্কন্দিত-নিরবচ্ছিন্ন; ব্রতঃ-ব্রত; অনুগ্রহাৎ- অহৈতুকী কৃপারপ্রভাবে; মহাবিষ্ণোঃ-মহাবিষ্ণুর (কারণোদকশায়ী বিষ্ণু); অবিঘাত-অপ্রতিহত; গতিঃ-গতি; ক্বচিৎ-কোন সময়ে।

অনুবাদ

তখন থেকে সর্বশক্তিমান বিষ্ণুর কৃপায় আমি অপ্রাকৃত জগতে এবং জড় জগতের ত্রিভুবনে অপ্রতিহতভাবে সর্বত্র ভ্রমণ করছি। কেন না আমি নিরন্তর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় দৃঢ়ব্রত হয়েছি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, জড় জগতের তিনটি লোক রয়েছে, যথা উর্ধ্বলোক, মধ্যলোক এবং অধঃলোক। উর্ধ্বলোকের উর্ধ্বে, অর্থাৎ ব্রহ্মলোকের উর্ধ্বে রয়েছে ব্রহ্মাণ্ডের জড় আবরণ এবং তার উর্ধ্বে চিদাকাশ, যার বিস্তৃতি অন্তহীন; সেখানে অসংখ্য জ্যোতির্ময় বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে, যেখানে ভগবান তাঁর নিত্যমুক্ত পার্ষদদের সঙ্গে বিরাজ করেন। নারদ মুনি জড় জগতের এবং চিজ্জগতের এই সমস্ত লোকে ভ্রমণ করতে পারেন, ঠিক যেমন পরমেশ্বর ভগবান নিজে তাঁর সৃষ্টির যে কোনও জায়গায় যেতে পারেন। জড় জগতের জীবেরা জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তম- এই তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু শ্রীনারদ মুনি জড়া প্রকৃতির এই সমস্ত গুণের অতীত, এবং তাই তিনি এইভাবে সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারেন। তিনি হচ্ছেন একজন মুক্ত মহাকাশচারী। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অহৈতুকী কৃপা অতুলনীয়; এবং তাঁর এই ধরনের কৃপা ভক্তরাই কেবল উপলব্ধি করতে পারেন। তাই ভক্তদের কখনও অধঃপতন হয় না। কিন্তু জড়বাদীদের অর্থাৎ সকাম কর্মী এবং মনোধর্মী জ্ঞানীদের প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অধঃপতন হয়। ঋষিরা, যাঁদের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, নারদ মুনির মতো চিজ্জগতে প্রবেশ করতে পারেন না। সে কথা নরসিংহ-পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে। মরীচি আদি ঋষিরা হচ্ছেন সকাম কর্মের আচার্য এবং সনক, সনাতন আদি ঋষিরা হচ্ছেন মনোধর্মী জ্ঞানের আচার্য। কিন্তু নারদ মুনি হচ্ছেন ভগবদ্ভক্তির আচার্য। ভগবদ্ভক্তি মার্গের সমস্ত মহাজনেরা 'নারদ ভক্তি-সূত্রের' নির্দেশ অনুসারে নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাই সমস্ত ভগবদ্ভক্তরা নির্দ্বিধায় ভগবানের বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করার যোগ্যতা লাভ করেন।

শ্লোক-৩২

দেবদত্তামিমাং বীণাং স্বরব্রহ্মবিভূষিতাম্।
মূর্চ্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানশ্চরাম্যহম্॥২৯॥

দেবদত্তাম-পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদত্ত; ইমাম্-এই; বীণাম্-বীণা; স্বরব্রহ্ম-চিন্ময় সঙ্গীতের স্বর; বিভূষিতাম্-বিভূষিত; মূর্চ্ছয়িত্বা-মূর্চ্ছনা; হরিকথাম্-ভগবানের কথা; গায়মানঃ-নিরন্তর গান গেয়ে; চরামি-ভ্রমণ করি; অহম্-আমি।

অনুবাদ

এইভাবে আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদত্ত এই বীণা বাজিয়ে পরব্রহ্ম বিভূষিত ভগবানের মহিমা নিরন্তর কীর্তন করি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে নারদ মুনিকে বীণা দান করেছিলেন, সে কথা লিঙ্গ পুরাণে বর্ণিত হয়েছে এবং শ্রীল জীব গোস্বামীও সে কথার উল্লেখ করেছেন। এই অপ্রাকৃত বাদ্যযন্ত্রটি শ্রীকৃষ্ণ এবং নারদ মুনি থেকে অভিন্ন, কেন না তাঁরা সকলেই অধোক্ষজ তত্ত্ব। এই বীণার স্বর অপ্রাকৃত এবং তাই এই বীণা বাজিয়ে নারদ মুনি যে ভগবানের মহিমা এবং লীলা বর্ণনা করেন তাও জড়াতীত অপ্রাকৃত তত্ত্ব। সঙ্গীতের সাতটি সুর-সা (ঋষভ), গা (গান্ধার), মা (মধ্যম), পা (পঞ্চম), ধা (ধৈবত), নি (নিষাদ) জড়াতীত এবং বিশেষ করে চিন্ময় সঙ্গীতের জন্যই সেগুলি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরূপে শ্রীনারদ মুনি সর্বদাই তাঁর দেওয়া বীণা বাজিয়ে তাঁর প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেন এবং এইভাবে তিনি নিরন্তর ভগবানের দিব্য মহিমা কীর্তন করেন, এবং তাই সেই অতি উচ্চপদ থেকে তাঁর কখনও পতন হয় না। শ্রীল নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই জড় জগতের মুক্ত পুরুষদেরও কর্তব্য সা-রে-গা-মা আদি সপ্ত স্বরের যথাযথ সদ্ব্যবহার করে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করা, যে নির্দেশ ভগবান নিজেও ভগবদ্গীতায় দিয়ে গেছেন।

(চলবে)

ছবিতে ছোটদের দশ অবতার

মৎস্য অবতার

ব্রহ্মা নিদ্রাতুর হয়ে ক্লান্তিতে হাই তুললেন, ব্রহ্মাজির সারাদিনের কাজ শেষ প্রায়। পরবর্তী কল্প আগত প্রায়, অজান্তেই তাঁর চোখের পাতা বুঁজে আসছিল। এভাবেই তার মুখপদ্ম থেকে বেদের অমৃতবাণী ঝড়ে পড়ছিল।
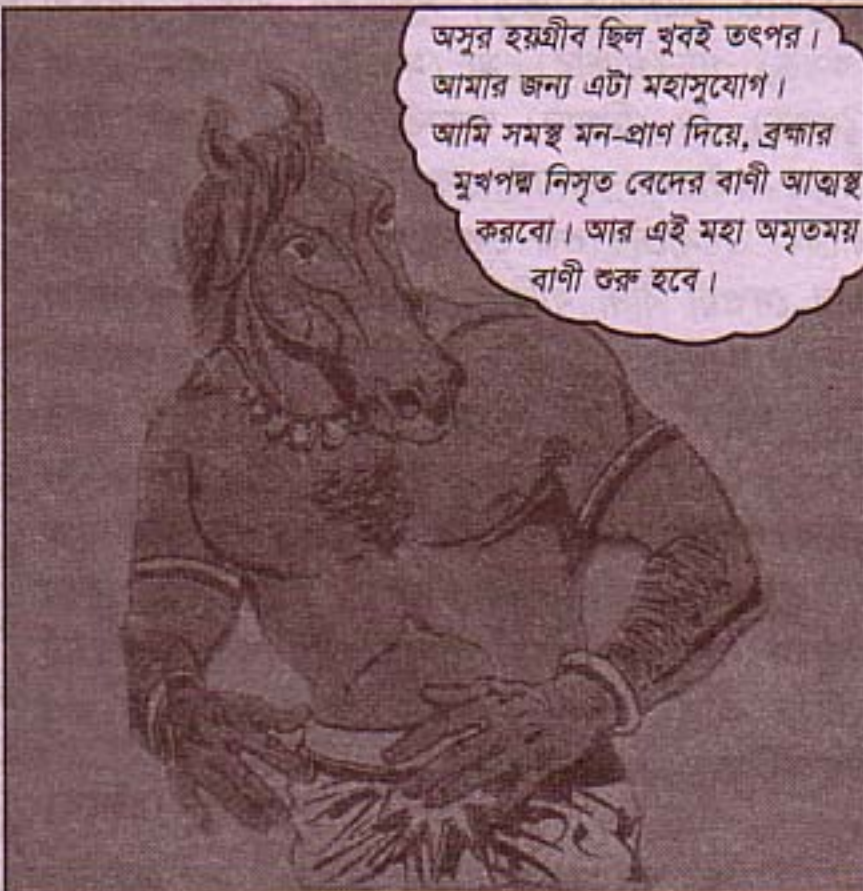
বিষ্ণু বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে ভাবলেন কি করবো আমি, রাজ পুরোহিত সত্যব্রত যিনি একজন পরম ভক্ত। সে তাঁর পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তখন জল অর্পণ করছিল। তিনি ভাবলেন আমি মৎস্য রূপ ধারণ করে বেদ সংরক্ষণ করবো এবং আমার ভক্ত সত্যব্রতের পরবর্তী কল্পারম্ভে সপ্তম মন্বন্তরে মনুরূপে আত্মপ্রকাশ করবো।
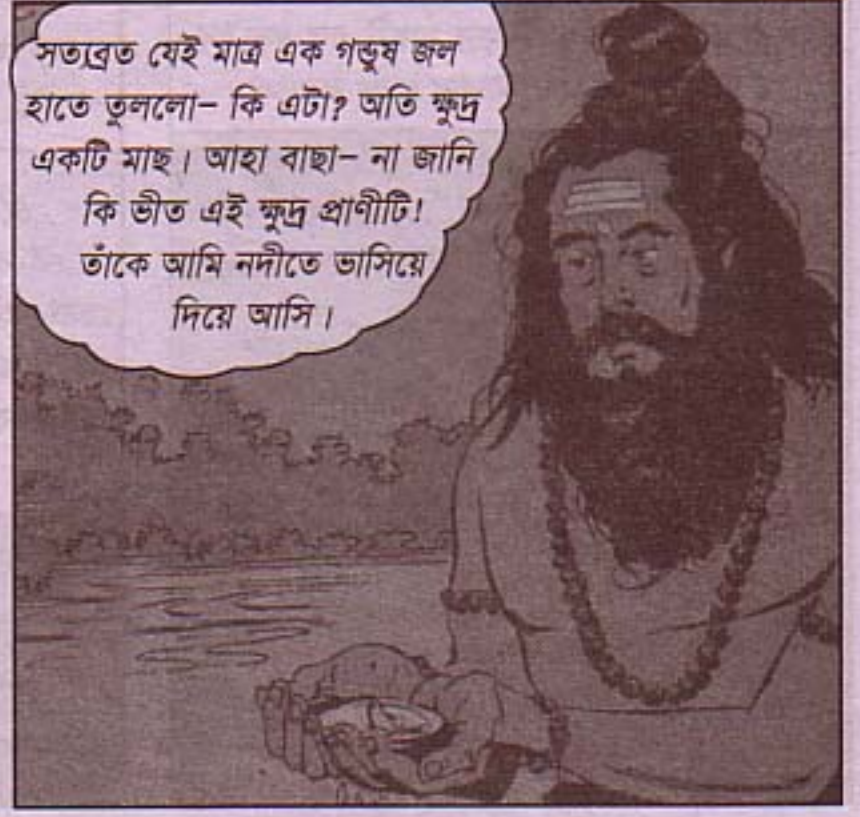
সত্যব্রত যেই মাত্র এক গণ্ডুষ জল হাতে তুললো– কি এটা? অতি ক্ষুদ্র একটি মাছ। আহা বাছা– না জানি কি ভীত এই ক্ষুদ্র প্রাণীটি! তাঁকে আমি নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে আসি।

যেই সে তাঁকে নদীতে ভাসাতে গেল– তখনি সে আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলো–
হে রাজন আমাকে আপনি নদীতে ভাসয়ে দেবেন না। আমি বড়ই অসহায়– নদীর অন্যান্য বড় প্রাণীরা আমাকে সংহার করবে।

সত্যব্রত খুবই বিস্মিত হল। হে ক্ষুদ্র প্রাণ,
তুমি দুশ্চিন্তা করো না, আমি অবশ্যই তোমাকে রক্ষা করবো।

সত্যব্রত তাঁর কমণ্ডুলের ভিতর মাছটি রাখলো–

অতপর সে মাছটিকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে এল।

সেই রাত্রেই– যদিও সেই ক্ষুদ্র মাছটি এত বড় হল– যে মাছটি কমন্ডুলের আকার ধারণ করালো।
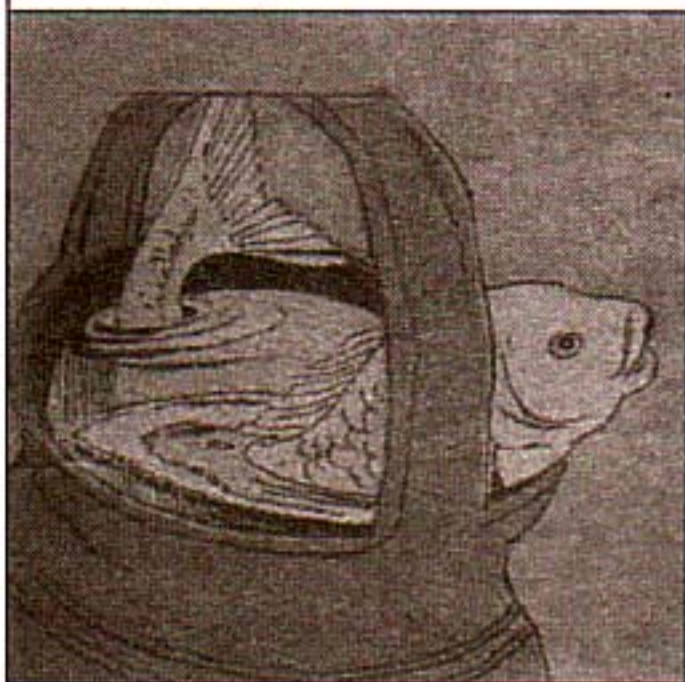
সকালে সত্যব্রত যখন দেখতে গেল মাছটি ঠিক– বেঁচে আছে কিনা?
ওহে রাজন– এই কমন্ডুলু খুবই ছোট– আপনি দয়াকরে আমার জন্য বড় একটি পাত্রের ব্যবস্থা করুণ।

তখন সতব্রত মাছটিকে কমন্ডুলু থেকে বের করে একটি বড় পাত্রে তাঁকে ছেড়ে দিল।

কিন্তু ঘন্টা খানেক পরেই......................
ক্ষুদ্র সেই মাছটি বললো –ওহে রাজন আপনার এই পাত্রটি আমার জন্য খুবই ছোট– আমি আপনার সাহায্যে প্রার্থণা করি– আপনি দয়া করে আমার জন্য আরো বড় জলাশয়ের ব্যবস্থা করুণ

সত্যব্রত মাছটি তাঁর আশ্রমের পুকুরে নিয়ে গেলেন এবং ক্ষুদ্র প্রাণীটিকে সেখানে ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু অনতিবিলম্বেই সেই মাছটি বৃহত আকার ধারন করে মস্ত পুকুরের আকারে পরিণত হলো।
মাছটি বলে উঠলো, ওহে রাজন আপনি আমাকে বড় এবং গভীর লেকের জলাশয়ে প্রেরণ করুণ। আমি মারা যাব যদি আপনি আমাকে এখানে রাখেন।

এবার সত্যব্রতের মনে সন্দেহ উঁকি দিল ।

সত্যব্রত প্রশ্ন করলেন- কে আপনি ? আমি তোমার মত বিস্ময়কর প্রাণী কখনও চোখে দেখিনি কানেও শুনিনি। যে এক দিনে এমন একটা বৃহত জলাশয়ের আকার ধারণ করতে পারে।

আপনাদের প্রশ্ন আমাদের উত্তর

প্রশ্ন ১। জগাই ও মাধাই সব রকমের পাপ আচরণ করা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের ক্ষমা করে কৃপা করলেন। কিন্তু সামান্য অপরাধে পরমভক্ত ছোট হরিদাসকে ক্ষমা করলেন না কেন ? অধিকন্তু ত্রিবেণীতে ছোট হরিদাস আত্মহত্যা করলেন। আত্মহত্যা কি মহাপাপ নয়?

প্রশ্নকর্তাঃ শ্রী মাধব সরকার, বক্সনগর, নবাবগঞ্জ, ঢাকা

উত্তর ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যদি জগাই-মাধাইকে কৃপা না করতেন তবে সাধারণ পাপাচারী মানুষেরাও হরিনামের প্রতি আকৃষ্ট হত না, কারণ সাধারণ মানুষ মনে করত 'আমরা তো পাপ করছি অতএব আমাদের আর সুন্দর হওয়ার আশা নেই, সদ্‌গতি নেই, তার চেয়ে এই জগতে থাকাকালীন পাপাচারের মাধ্যমেও সুখভোগ করে যাওয়া ভাল, পরজন্মের অবস্থা যখন ভয়ংকর তখন এই জীবনই উপভোগ করে যাই।' কিন্তু মহাপ্রভু মহাবদান্য অবতার শিক্ষা দিলেন অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তিও যদি হরিনাম কীর্তন করে এবং পাপাচার বন্ধ করে দেয় তা হলেও সে সুন্দর জীবন পেয়ে ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়ার সুযোগ পাবে।

কিন্তু ছোট হরিদাসকে সেইভাবে ক্ষমা না করার কারণ হল, হরিভজন করতে এসে, বৈরাগ্যভাব দেখিয়ে মনে মনে ভোগ লালসা থাকলে অন্তর্যামী ভগবান কখনও প্রসন্ন হন না, সেই শিক্ষা দেওয়াই ছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য। তিনি যদি ছোট হরিদাসকে ত্যাগ না করতেন, তবে কপট ভক্তরা নানা ঘটনায় অজুহাত দেখিয়ে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গে লিপ্ত হত। এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পবিত্র ভক্তিপন্থাকে কলুষিত করত। আমরা জানি না ছোট হরিদাসের কি অপরাধ ছিল, কিন্তু অন্তর্যামী মহাপ্রভু জানেন। তাঁকে ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়তে হবে। তাই মহাপ্রভুকে যেদিন শ্রীবাস ঠাকুর ছোট হরিদাসের কথা জিজ্ঞাসা করেন তখন উত্তরে মহাপ্রভু বলেন স্বকর্মফলভুক্ পুমান্' অর্থাৎ "মানুষ তার আপন কর্মের ফল ভোগ করে।" পরম পূজনীয়া মাধবী দেবী ছিলেন মহা তপস্বিনী কিন্তু ছোট হরিদাসের দৃষ্টিভাব হয়তো ভাল ছিল না।

যখন মহাপ্রভু জানলেন ছোট হরিদাস একবছর মহাপ্রভুর কৃপা অপেক্ষা করে করে নিরাশ হয়েই ত্রিবেণীতে প্রাণবিসর্জন করেছে, তখন মহাপ্রভু বললেন, "এটিই হচ্ছে অবৈধ সঙ্গবাসনার প্রায়শ্চিত।" অর্থাৎ মহাপ্রভু শিক্ষা দিলেন যদি কারও মনে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বাসনা জন্মে তবে তার উচিত ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ করে প্রায়শ্চিত্ত করা। ছোট হরিদাস দেহ ত্যাগ করেই মহাপ্রভুর পদাশ্রয় লাভ করেছে– সেই কথা ভক্তরা বুঝেছিলেন।

বর্তমানে আমরা এই দেশে 'বৈষ্ণব-ধর্মের' নামে বহু ভেকধারী তিলকধারী বৈষ্ণব গোপনে প্রচার করে বেড়াচ্ছে আপন ইন্দ্রিয় তর্পণ মানসে–"খেয়ে মাছের ঝোল, শুয়ে নারীর কোল, মুখে হরি বোল"। এভাবে তারা অবশ্যই নরকের রাস্তা তৈরি করছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় লাভ করতে হলে আমাদের কত সাবধান হয়ে চলতে হবে সেই কথা মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত তাঁর 'প্রেমবিবর্ত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "যদি প্রণয় রাখিতে চাও গৌরাঙ্গের সনে। ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥" ইন্দ্রিয় লালসা ত্যাগ না করলে মহাপ্রভু তাকে গ্রহণ করেন না। আবার এটাও ঠিক যে, প্রভুর অনুগত ভক্তের অধঃপতন হলেও তিনি ভগবানের কৃপার প্রভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার সুযোগ পান।

পবিত্র ত্রিবেণীতে দেহ বিসর্জন দিয়ে ছোট হরিদাস মহাপাপ করেননি। তিনি মহাপ্রভুর পদসেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে হতাশাচ্ছন্ন হয়েছিলেন, তাই আপন কর্মদোষের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য ত্রিবেণীতে দেহ বিসর্জন দিয়েছিলেন। মহাপ্রভু তার সেই কর্মকে 'প্রায়শ্চিত' বলেই উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন ২। মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্মপ্রাণ হয়েও নরক দর্শন করলেন, অথচ দুরাচারী দুর্যোধন স্বর্গগমন করলেন। এর কারন কি?

প্রশ্নকর্তাঃ শ্রী শ্রীধাম সরকার (শিক্ষক), বাড়ৈখালি উচ্চ বিদ্যালয়, মুন্সীগঞ্জ।

উত্তর ঃ মহারাজ যুধিষ্ঠির নরকেও যাননি, স্বর্গেও যাননি। মহাপ্রস্থান বলতে ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠে গমনের কথাই বোঝায়। রাজা কুরু স্বর্গরাজ ইন্দ্রের কাছে একটি বর পেয়েছিলেন, কুরুক্ষেত্রে যে নিহত হবে সে স্বর্গে গমন করবে। তাই দুর্যোধনের স্বর্গে গতি হয়। ভগবান

শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে যে মৃত্যু বরণ করে সে কখনও নরক ভোগ করে না। পাণ্ডবরা ছিলেন ভক্ত। তাঁরা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতেন, কৃষ্ণের সান্নিধ্য কামনা করতেন, তাঁরা কৃষ্ণধাম বৈকুণ্ঠদ্বারকায় গতিলাভ করেছেন। অনেকে বলেন স্বর্গে গিয়েও যুধিষ্ঠির 'অশ্বত্থামা হত' এরূপ একটি মিথ্যা কথা দ্রোণাচার্যের সম্মুখে বলার ফলে নরক দর্শন করলেন। কিন্তু আমাদের জানতে হবে, স্বর্গে কখনও নরক দর্শন হয় না। নরক হচ্ছে একটি পৃথক গ্রহলোক। স্বর্গলোক হচ্ছে সম্পূর্ণ সুখময় একটি গ্রহলোক। অধিকন্তু যুধিষ্ঠির যদি 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' এই কথাটি না বলতেন তবে তাঁর জীবনে নতুন কোনও বিঘ্নই সৃষ্টি হত। কারণ ভগবানেরই নির্দেশে তিনি সেই কথাটি উচ্চারণ করেছেন বলে তা যথার্থই হয়েছে। তা ছাড়া সত্যই অশ্বত্থামা নামে একটি হাতী তো নিহত হয়েছিল। বরঞ্চ ভগবানের কথা অবজ্ঞা করলে তাঁকে নরক দর্শন করতে হত।

প্রশ্ন ৩। যাকে দেখা যায় না তার অস্তিত্বে বিশ্বাস কি? ভগবান আছেন তার প্রমাণ কি? বরং বিজ্ঞান সত্য, কারণ বিজ্ঞানের একটা যুক্তি বা প্রমাণ রয়েছে। এরূপ মন্তব্যের উত্তর কি ?

প্রশ্নকর্তাঃ বীণা রানী বিশ্বাস, সিনিয়র নার্স, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

উত্তর ঃ নিছক বিশ্বাসের উপর কারও অস্তিত্ব নির্ভর করে না। আপনি-আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না, তাই আপনি যদি বলেন, "আমার বিশ্বাস যে ওর অস্তিত্ব নেই, যেহেতু দেখতে পাচ্ছি না। তা হলে তো আমি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ছি না। তা ছাড়া আপনার দেখার ক্ষমতাই অতি নগণ্য। আপনার মাথায় কয়টা চুল দেখতে পান না। শরীরের ভেতরে কি আছে দেখতে পান না। পেছনের দিকে কি আছে দেখতে পান না। চোখের পাতাটিকেই দেখতে পান না। চোখের সামনে কোন আবরণী থাকলে তার সামনের বস্তুকেও দেখতে পান না। একেবারে চোখের কাছে একটি কাগজ ধরলে তাতে কি লেখা আছে দেখতে পান না। দূরের বস্তুগুলি কি রয়েছে তাও দেখতে পান না। আবার আপনি অনেক উল্টো পাল্টা বস্তু দেখেন যেগুলি সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি দেখে না। যেমন, অন্ধকারে দড়িটাকে সাপ দেখেন, গাছটাকে ভূত দেখেন, টিনকে পয়সা দেখেন, কাগজকে টাকা দেখেন, যদুকে মধু দেখেন একটি লোকের অপেক্ষায় রয়েছেন তাই অন্য কেউ যদি এসে পৌছায় আপনি হঠাৎ সেই লোক বলেই দেখেন যার অপেক্ষায় রয়েছেন। আপনার সঙ্গে যদি কারও শত্রুভাব থাকে তবে তার সঙ্গে কোন কারণে আপনার গায়ে ধাক্কা লাগলে আপনি তখন দেখেন যে সে ইচ্ছা করেই হিংসা করে ধাক্কা দিল। জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হলে সবুজ গাছপালাও হলুদ দেখতে পাবেন। এইরূপ বহুবিধ দৃষ্টান্ত রয়েছে। সুতরাং কারও অস্তিত্ব আছে কি নেই তা কেবল দেখেই বিশ্বাস করার কোনও যুক্তি অগ্রহ্য নয়। কারণ যথার্থ ভাবে দেখা কর্মটিই সম্পাদিত হচ্ছে না।

প্রথমত, অল্প কিছু দেখছেন, অধিকাংশ বস্তুই দেখার বাইরেই থেকে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, অনেক বস্তু ভুল দেখছেন তৃতীয়ত, এমন অনেক জিনিস আপনি দেখছেন, যার কোনও অস্তিত্বই নেই। যেমন, আপনি বিছানায় শুয়ে আছেন। অবশ্যই আপনার চোখ বন্ধ আছে। কিন্তু তবুও আপনি দেখছেন একটা বিশাল বন। ভয়ংকর একটা বাঘ আপনাকে তাড়া করছে। আপনি চিৎকার করে উঠলেন। বাঘ বাঘ বলে চেঁচালেন। লোকও চমকে উঠল। আপনিও ভয়ার্ত হয়ে জেগে উঠলেন। চোখ মেলে দেখলেন। বন নেই, কোনও বাঘেরও অস্তিত্বই নেই। আপনি আপনার ঘরের ভেতরে ঘুমিয়ে ছিলেন মাত্র। অর্থাৎ আপনার কাছে বন নেই, বাঘ নেই, আপনার কাছে বাঘের কোন অস্তিত্বই নেই অথচ আপনি দেখলেন বাঘ আপনাকে তাড়া করছে। এই দেখার কি মূল্য?

অতএব আপনার দেখার ওপরে কারও অস্তিত্ব নির্ভর করছে না। যে বস্তু আপনি দেখেননি, সেই বস্তু সম্বন্ধে বই পড়ে, কারও কাছে শুনে সেই বস্তুর অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন। অনুরূপভাবে, ভগবানকে আপনি দেখেননি, কিন্তু ভগবান সম্বন্ধে শাস্ত্র পড়ে, মহাজনদের কথা শুনে, ভগবানের অস্তিত্ব বিশ্বাস করতেই হয়।

নাস্তিক সংস্কৃতিতে যাদের জন্ম তারা ভগবান মানে না, তারা ভগবানকে দেখতে পায় না। ঠিক যেমন পেঁচার বংশে যাদের জন্ম তারা সূর্য দেখতে পায় না। "উলুকে না দেখে কভু সুর্যের কিরণ," (চৈতন্য চরিতামৃত) পেঁচা সূর্যকে দেখতে পায় না। তাই বলে কি সূর্যের অস্তিত্ব নেই? রাত্রিতে সূর্য দেখা যায় না, তাই বলে কি সূর্যের অস্তিত্ব নেই? অতএব যারা পেঁচো দৃষ্টিসম্পন্ন তাদের দেখার বা বিশ্বাসের উপর ভগবানের অস্তিত্ব নির্ভর করছে না।

তার পরের প্রশ্নটি হচ্ছে, বিজ্ঞান সত্য কারণ তার যুক্তি আছে, ভগবান সত্য নয় কারণ তার যুক্তি নাকি নাই। এর উত্তর এই যে, ভগবানের কথা শাস্ত্র মাধ্যমে ভক্তরাই জানতে পারেন। সেখানে বলা হয়েছে, ভক্ত্যা মাম্

অভিজানাতি–ভক্তরাই ভগবানকে জানতে পারে। মূঢ়হয়ং নাভিজানাতি– গণ্ড মূর্খেরা ভগবানকে জানতে পারে না। দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে, বিজ্ঞান সত্য। বিজ্ঞান একমাত্র ভক্তরাই মেনে চলে, অভক্তরা বিজ্ঞান অমান্য করছে। তারই প্রমাণ আধুনিক বিশ্বে দেখা যাচ্ছে। অভক্তরা বিড়ি, সিগারেট, খৈনি, দোক্তা, জর্দা হিরোইন, গাঁজা, চরস, এলএসডি খেয়ে নিজেদের এবং ইন্দ্রিয়তর্পণ তথা অসংযত কামের বশে সমাজকে কলুষিত করছে। তাসপাশা ও জুয়ার আড্ডা জাঁকিয়ে মানবিক পরিবেশ দূষিত করছে। মাছ-মাংস, ডিম, রক্ত, হাড়, পিত্ত খেয়ে মনুষ্য জাতির ধর্ম-বিজ্ঞানটাই নষ্ট করছে। এইভাবে সমগ্র মানব সভ্যতাকে তাদের খেয়াল-খুশিমতো তছনছ করছে। বিজ্ঞানের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। কারণ তারা বিজ্ঞানের আসল ব্যবহার সম্পর্কে অসচেতন। অভক্তরাই বিজ্ঞান মানে না।

তৃতীয় কথাটি হচ্ছে বহু বিজ্ঞানীই ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। স্টিফেন, আইজাক নিউটন, আইনস্টাইন ইত্যাদি বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানী পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। স্যার আইজাক নিউটন তাঁর এক নাস্তিক বন্ধুকে বলেছিলেন, "দেখ, এই মহা বিশ্বের কত বড় বড় অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রপুঞ্জ শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে, নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে। এর পেছনে এক পরম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব রয়েছে। নইলে কি করে সম্ভব হয়। কোন কিছু করতে গেলে আমাদের কত রকমের পরিকল্পনা, কত বুদ্ধি খাটাতে হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের আবহমানকাল ধরে নিয়মশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিভাবে ওসব পরিচালিত হচ্ছে? নিশ্চয়ই কেউ পরিচালক রয়েছেন।"

বড় বড় খ্যাতনামা ডাক্তারও বলেন, "একটি প্রাণীর প্রাণসত্ত্বা রয়েছে, আবার সব রকম সুবন্দোবস্ত রয়েছে, কে এসব বিধান করেছে? আবার সুবন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও কি করে প্রাণসত্ত্বা শরীর থেকে নির্গত হয়? কোন অদৃশ্য শক্তি কোথা থেকে আসে আর কোথায় যায়? নিশ্বয়ই বিধাতার ক্রিয়া কৌশল।"

পরিশেষে, কেউ যদি বুঝতে না পারে সে চিন্তা করতে থাকে, বুঝতে চেষ্টা করে। চিন্তাশীল লোকেরাই ভক্ত ভাবাপন্ন হন। হট্ মেজাজী লোকেরা হট্ করে একটা মন্তব্য ছুঁড়ে দেয়। কোন প্রকৃত বিজ্ঞানী হট্ করে মন্তব্য করেন না। তাছাড়া বিজ্ঞানযোগ নামে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায় অধ্যয়ন করলে মানুষ বুঝতে পারবে যে, ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞানই চূড়ান্ত ও পরম বিজ্ঞান।

প্রশ্ন ৪। ঠাকুর হরিদাস কি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, না যবনকূলে ?

প্রশ্নকর্তাঃ শ্রী ননীগোপাল রাজবংশী, দোহার, ঢাকা।

উত্তর ঃ হরিদাস ঠাকুর যবনকূলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে (আদি ১৬/৭০-৭১) হরিদাস ঠাকুরের প্রতি গৌড়ের বাদশার উক্তি–

আপনে জিজ্ঞাসে তাঁকে মুলুকের পতি।
'কেনে, ভাই ! তোমার কিরূপ দেখি মতি ? ॥
কত ভাগ্যে, দেখ, তুমি হৈয়াছ যবন।
তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহ' মন ?' ॥ "

তা ছাড়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে (অন্ত্যঃ ১১।২৭,৩০) মহাপ্রভুর প্রতি শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের উক্তি–

"হীন–জাতি জন্ম মোর নিন্দ্য–কলেবর।
হীনকর্মে রত মুঞি অধম পামর ॥
অনেক নাচাইলা মোরে প্রসাদ করিয়া।
বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইলু'ম্লেচ্ছ' হঞা ॥"

প্রকৃতপক্ষে হরিদাস ঠাকুর ছিলেন ব্রহ্মা স্বয়ং । তিনি সরাসরি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে ভগবৎ-তত্ত্ব বিজ্ঞান লাভ করেছিলেন। তাই ব্রহ্মা হচ্ছেন ভগবৎ তত্ত্ব বিজ্ঞানের প্রথম আচার্য। ভগবানের শুদ্ধভক্ত যে কুলে বা যে বংশেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন তাতে কিছু আসে যায় না, তিনি এই সবের উর্ধ্বে অপ্রাকৃত স্তরে অবস্থিত।

প্রশ্ন ৫। জপের থলির ছিদ্র দিয়ে তর্জনী আঙ্গুলটিকে বাইরে রাখা হয় কেন ? ঐ আঙ্গুল দিয়ে মালা স্পর্শ করা নিষেধ কেন ?

প্রশ্নকর্তাঃ শ্রী সুনীল রাজবংশী, পাউসার, মুন্সীগঞ্জ।

উত্তর ঃ আমরা সাধারণত তর্জনী দিয়ে এই জড় জগতের বস্তুসমূহকে নির্দেশ করে থাকি। ঐ আঙ্গুল দিয়ে আমরা এই প্রাকৃত জগতের পাপ-পূণ্য, ভাল-মন্দকে দেখিয়ে থাকি। যা প্রাকৃত ভাল-মন্দকে নির্দেশ করে থাকে তা অপ্রাকৃত হরিনাম বা অপ্রাকৃত তুলসীকে স্পর্শ করতে পারে না।

প্রাকৃত সঙ্গ বা দুঃসঙ্গ বর্জন করে অপ্রাকৃত হরিনাম জপ-

কীর্তন করতে হয়। এই নির্দেশটিকে সর্বদাই মনে রাখার জন্যই আমরা প্রাকৃত বা জড় বস্তু নির্দেশক তর্জনীকে জপের থলির ছিদ্র দিয়ে বাইরে রাখি।

প্রশ্ন ৬। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোথায় এবং কিভাবে দেহ রেখেছেন ?

প্রশ্নকর্তাঃ শ্রী সুভাষ চন্দ্র দাস, কুমিল্লা।

উত্তর ঃ ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন সৎ, চিৎ ও আনন্দময় পরম-ব্রহ্ম ; তাই তাঁর জন্ম, মৃত্যু নেই, তিনি আদি পুরুষ। তিনি যেমন যোগমায়ার দ্বারা প্রকটলীলা বিস্তার করেন, তেমনি যোগমায়ার দ্বারা অপ্রকটলীলাও প্রকাশ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই ধরাধামে ৪৮ বছর প্রকট লীলা বিস্তার করেছিলেন। তিনি তাঁর শেষ লীলার ১৮ বছর পুরীতে গম্ভীরালীলায় শ্রীমতী রাধারানীর বিরহের ভাবে বিপ্রলম্ভ রস আস্বাদন করে ছিলেন, এবং গদাধর গোস্বামী প্রভুর সেবিত বিগ্রহ শ্রীটোটা গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গের সাথে মিশে যান। মনোহর রূপসম্পন্ন এই গোপীনাথের মন্দির এখনও পুরীতে বিরাজমান। মহাপ্রভুর অপ্রকটলীলা সম্বন্ধে শ্রীল নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকরে (৮।৩৫৬-৩৫৭) শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রতি মামু গোস্বামীর উক্তি এই রকম-

"ন্যাসিশিরোমণি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার ?
অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার ॥
প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে
হৈলা অদর্শন,-পুনঃ না আইলা বাহিরে ॥'

প্রশ্নোত্তরেঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

প্রশ্ন ৭। শুনেছি মা বাবার অনুমতি ছাড়াও নাকি ভগবানের ভক্ত হওয়া যায়। আমরা যদি বৃদ্ধ পিতা মাতাকে ছেড়ে ভগবানের দাস হয়ে মন্দিরে বসবাস করি তাহলে পিতামাতা কি আমাদের অভিশাপ দেবে না ? এতে কোন পাপ হবে না ? জানতে চাই ?

প্রশ্নকর্তাঃ সমিরন চন্দ, এম,সি, কলেজ, টিলাগড়, সিলেট।

উত্তরঃ আপনি যদি ভগবানের ভক্ত হতে চান, তাহলে আপনার পিতামাতার আর্শিবাদ নিয়ে আপনি কৃষ্ণভাবনাময় জীবন যাপন করতে পারেন। সেটা আপনার জন্য খুবই ভাল। আর যথার্থ পিতা-মাতা তাঁদের সন্তান যদি কৃষ্ণভক্ত হয় তাহলে তিনি আনন্দিত হবেন এবং নিজেকে সৌভাগ্যশালী মনে করবেন। কারন অনেক সাধনার পর মানুষ ভগবৎ চরণে আত্মসমর্পণ করেন। ভগবদ্গীতায় জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে বাসুদেবঃ সর্বমিতি স-মহাত্মা সুর্দুলভঃ ভঃগীঃ ৭/১৯, বহুজন্মের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে সর্ব কারণের পরম কারন রূপে জেনে আমার শরনাগত হয়। সেই ধরনের মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

যারা মহাত্মা তারা ভগবানের চরনে আত্মসমর্পন করেন। আর যারা দুরাত্মা তারা ভগবানের চরণে শরণাগত হয় না। যেমন হিরন্যকশিপু মস্ত বড় অসুর ছিলেন। সে যখন জানতে পারল তার ছেলে প্রহলাদ হরির ভক্ত হয়েছে তখন তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এবং সে তখন তার পুত্রের প্রতি অমানবিক অত্যাচার শুরু করেছিল। অসুরেরা নিজের স্বার্থের ক্ষতি হলে আত্মীয় বা পুত্র কন্যা কাউকে ক্ষমা করেন না। যদি হিরণ্যকশিপুর মত পিতা-মাতা হয় তাহলে সে নিজ পুত্রকে ক্ষমা করেন না। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন 'কোন চিন্তা না করিবে পাপ নাহি হবে। আমার শরনে তুমি পরা শান্তি পাবে।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা। তিনি ক্ষুদ্র পিপিলিকা থেকে শুরু করে বিশাল হাতির খাদ্য সরবরাহ করছেন। আমরা যদি ভগবানের নির্দ্দেশিত আইনের মাধ্যমে আমাদের জীবনযাপন করি তাহলে পৃথিবীতে কোন প্রাণীর সমস্যা হবে না।

আর ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করলে সমস্ত জীব জগতের সেবা করা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে-

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃনাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণীচ রাজন্।
সর্বাত্মানা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্।
ভাগবত- ১১/৫/৪১

যে সব কিছু ত্যাগ করে মোক্ষ দানকারী মুকুন্দের চরণ কমলে শরণ নিয়েছে তার আর দেব-দেবী, মুনি, ঋষি, পরিবার, পরিজন, মানব সমাজ এবং পিতৃপুরুষের প্রতি তাঁর কোন কর্তব্য থাকে না। পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার ফলে এই ধরণের কর্তব্য গুলি আপনা থেকেই সম্পাদিত হয়ে যায়।

প্রশ্নোত্তরেঃ শ্রী পুষ্পাশীলা শ্যাম দাস ব্রহ্মচারী

**"সমুদ্রের ফেনা ক্ষণে সৃষ্টি ক্ষণে লয়
মায়ার সংসারে হয় সেই ভাব উদয়"**

প্রভুপাদের পত্রাবলী

অনুবাদক: প্রাণেশ্বর চৈতন্য দাস

সান্ফ্রানসিস্কো
১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭
আমার প্রিয় সৎস্বরূপ,

আমার আশির্বাদ নিও। ইতিপূর্বে তোমার কাছে প্রেরিত পত্রে যে বিষয়ের উল্লেখ করেছিলাম আশাকরি তা অবগত আছ। অদ্যাবধি নারদ ভক্তিসূত্রের কপিটা পাইনি, তোমরা যে গ্রন্থটির ভাষ্য রচনার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছ। আশাকরি তোমরা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্পর্কে যে বক্তৃতা করেছিলাম তার সংকলন তোমরা তৈরী করেছ। তোমরা শ্রীচৈতন্য শিক্ষার যে সংকলন করেছ তার একটা কপি আমাকে পাঠিও, আমি তাহলে বুঝতে পারবো সেটা কেমন হয়েছে? বর্তমানে আমার কাছে পাঁচটি টেপ করা বক্তৃতা রয়েছে তার থেকে একটা তোমাকে পাঠাচ্ছি। তবে আমাকে জানাতে ভুল না যে, তোমার কাছে কয়খানা টেপ রয়েছে। নীল এর এখানে আসবার কথা ছিল কিন্তু সে এখনো আসেনি সুতরাং আমি টেপগুলি পাঠাচ্ছি সংকলন করার জন্য। আশাকরি তোমরা এ কাজটি খুব সুন্দর ভাবে করবে কৃষ্ণ তোমাদের সহায় হোন।

আমি ব্রহ্মানন্দকে নির্দেশ দিয়েছি যে, ৬২০০ ডলার যেন সে আমার সেভিংস একাউন্টে এখনই প্রেরণ করে। আমি তাঁকে একাউন্ট ট্রানসফার করার জন্য পাঠিয়েছি তুমি অথবা সে স্বাক্ষর করে সেটি ব্যাংকে পাঠিয়ে দেবে। আমি তোমাকে দুটি কারনে ব্যাংকের যাবতীয় কাজের জন্য মনোনীত করেছি। প্রথম কারন হচ্ছে– আমি আর্থিক ব্যাপারে সমস্ত কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবো আর পাশাপাশি তুমিও কাজটি ভালভাবে শিখতে পারবে। কিন্তু সম্প্রতি অনেক চেক প্রেরণে ও আনুসাঙ্গিক কারনে আমার মনে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। অত্যধিক চেক প্রেরণ ও ব্যাংকের সাথে বিভিন্ন কাজের লেনদেন করার জন্য প্রায় ১০০০ ডলারের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

ব্রহ্মানন্দের সাথে পত্রে যোগযোগ হয়েছে তাতে আমার ধারনা যে বিভিন্ন কারনেই ওখানে বাড়ী পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবেনা। প্রধান কারন হচ্ছে আমাদের নগদ টাকা নেই আর এমন কেউ নেই যে নগদ টাকা দিবে বাড়ী ক্রয় করার জন্য। তাছাড়া বাড়ীটা এখনও পুরোপুরি তৈরী নয় যে তা থেকে কোন আয় হতে পারে। আর এটা মনে করার কোন কারন নেই যে বাড়ীটা ক্রয় করা আশাব্যঞ্জক এবং মিঃ পেনে শুধু আমাদের মিথ্যা আশা দিচ্ছেন। এখনকার অনুগামী শিষ্য এবং আমাদের পক্ষের ট্রাস্টিগণেরও তাই সিদ্ধান্ত। তাছাড়া আমারও তাই মত। সুতরাং এই কারনেই উক্ত টাকাটি অতিসত্ত্বর প্রেরণ করা হবে। যদি বাড়ীটি ক্রয় করা প্রয়োজন হয়ে থাকে আবারও টাকাটা পুনঃ প্রেরণ করা হবে যেমন ইতিপূর্বে করেছি।

তোমরা সকলে নিষ্পাপ সাধারণ ও সরলপ্রাণ। এই সব ধূর্ত জাগতিক লোকেরা যে কোন সময় তোমাদের প্রতারণা করতে পারে। সুতরাং তোমরা সর্তক হবে এবং কৃষ্ণভাবনায় যুক্তহলে আর কৃষ্ণের ইচ্ছা হলে বাড়ীটা এমনিতে ক্রয় করতে পারবো। কিন্তু আমরা কৃষ্ণের কাছে কখনও বাড়ীটার জন্য প্রার্থণা করবো না যখন কৃষ্ণের ইচ্ছা হবে তখন কৃষ্ণ নিজেই তা আমাদের দেবেন। মিঃ পিনে বাড়ীটা দিতে পারেন কিন্তু কার্য কারনে বুঝা যাচ্ছে যে, মিঃ পিনে কোন ভাবেই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পাবে না। তবে যদি কেউ বাড়ী ক্রয় করার জন্য আর্থিক দান দিতে চান তবে তা ভিন্ন একটা ব্যাপার। সে ক্ষেত্রে আমাদের উচিত হবে না কৃষ্ণের দয়ার জন্য অপেক্ষা করা আর কষ্ট করে আয়কৃত অর্থ কৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করা। আশাকরি তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না।

তুমি এবং গর্গমুনি অবশ্যই সর্তক হবে। লক্ষ্য রাখবে ৬৫০০ ডলার এর চেকটি যেন ভুলভাবে ব্যবহার করা না হয়।

আশাকরি তোমরা সকলে কুশলে আছ পরবর্তী ডাকে তোমাদের শুভ সংবাদ পাব। রায়রামকে বলবে আমাকে পত্র দেবাব জন্য। আমি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে আছি,যে এলাসটিন এর সাথে কোন আলোচনা হয়েছে কিনা।

তোমাদের চির শুভাকাঙ্খী
এ.সি ভক্তি বেদান্ত স্বামী

কৃষ্ণানন্দের প্রতি চিরকুট :
প্রিয় কৃষ্ণানন্দ,

তুমি নিউইয়র্ক এ নেই তবে যেহেতু এখানে আমি নাই সেহেতু তোমার উপস্থিতি বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তোমার মন্ট্রিয়েল যাত্রা বাতিল করা হয়েছে। প্লেনে করে মৃদঙ্গ গুলি যাতে ঠিক মত ও নির্বিঘ্নভাবে ছাড়িয়ে নিতে পারো সেদিকে নজর রেখ। আমার ধারনা জলদূত জাহাজটি হয়তো ইতিমধ্যে নিউইয়ার্ক পৌছে যাবে। সঠিক যত্ন নিয়ে ও সব মালামাল ছাড়িয়ে নেবে। আশাকরি তোমরা সকলে কুশলে আছ।

তোমাদের চির শুভাকাঙ্খী
এ.সি ভক্তি বেদান্ত স্বামী

(৪০ পৃষ্ঠার পর)

আমাদের করতে হবে, তবে আমাদের চেষ্টাটাই সব বলে মনে করলে চলবে না। যেমন, নিঃশ্বাস নেবার সময় আমাদের নিজেদের কিছু চেষ্টার প্রয়োজন হয় ঠিকই, কিন্তু বায়ুতে অক্সিজেন আছে বলেই আমরা নিঃশ্বাস নিতে পারছি। বায়ুতে অক্সিজেন না থাকলে আমাদের ফুসফুস যত জোরেই সঞ্চালন করি না কেন, একটু শ্বাসও আমরা তখন নিতে পারি না।

আধুনিক যুগে অনেকেই মনে করে যে, তথাকথিত যান্ত্রিক প্রগতির দ্বারা খাদ্য-শস্যের অভাব মোচন হবে। কিন্তু একটু বিবেচনা করলেই আমরা বুঝতে পারি যে, খাদ্য-শস্যের উৎপাদন যন্ত্রের দ্বারা হয় না। পৃথিবীর সমস্ত ট্রাক্টর একত্রিত করেও যদি সাহারা মরুভূমিতে চাষ করার চেষ্টা করা হয়, তা হলেও এক দানা চাল পর্যন্ত উৎপাদন করা যাবে না। পক্ষান্তরে, এইভাবে যন্ত্রের দ্বারা প্রকৃতিকে শোষণ করার চেষ্টা করা হলে প্রকৃতি তার দান বন্ধ করে দেবে। তখন সারা পৃথিবী এক বিশাল মরুভূমিতে পরিণত হবে। কিছু কিছু বিজ্ঞানী ইতিমধ্যেই আশঙ্কা করতে শুরু করেছে। তাঁরা বলেছেন, অত্যন্ত উগ্র রাসায়নিক সার ব্যবহার করার ফলে জমিতে সাময়িকভাবে আশাতিরিক্ত ফসল হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তার ফলে জমির স্বাভাবিক উর্বরতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এবং তার ফলে অচিরেই জমির উৎপাদন ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যাবে। তাই পাশ্চাত্যের বহু বিচক্ষণ কৃষক এখন রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার করতে শুরু করছেন।

কমিউনিজমের সূচনা হয় প্রচন্ড অভাব থেকে। পুঁজিবাদীদের শোষণে জনসাধারণকে জর্জরিত হতে দেখে কার্ল মার্ক্স রাষ্ট্রের সম্পত্তি সমবন্টনের মতবাদ স্বরূপ কমিউনিজমের পন্থা উদ্ভাবন করেন। আদর্শগতভাবে এটি একটি অতি সুন্দর মতবাদ হলেও

ব্যবহারিকভাবে এতে অনেক গলদ রয়েছে। এর প্রথম গলদটি হল রাষ্ট্রকে সব কিছুর কেন্দ্র বলে মনে করা এবং সব কিছুকে রাষ্ট্রের সম্পদ বলে মনে করা। রাষ্ট্র একটি নৈর্ব্যক্তিক ধারণা, তার কোনও অস্তিত্ব নেই। আর যদি তা থেকেও থাকে তা হলে তা হচ্ছে একটি অচেতন জড় পদার্থ। সুতরাং কোন জড় পদার্থ যেমন মালিকানা দাবি করতে পারে না, রাষ্ট্রও তেমনি মালিকানা দাবি করতে পারে না। একটি ঘরে কোনও জিনিস থাকলে যেমন সেটিকে ঘরের সম্পত্তি বলে মনে করাটা ভুল হবে, তেমনই সবকিছুই রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলে মনে করাটাও ভুল। কমিউনিষ্টরা সেই সম্বন্ধে বলে, সব কিছু জনসাধারণের সম্পত্তি। কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না, কেননা জনসাধারণ দেশের অধিবাসী হতে পারে, কিন্তু তাই বলে তারা দেশের মালিক নয়। যেমন, ঘরে অনেক পিঁপড়ে, আরশোলা, টিকটিকি, ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীগুলি সেই ঘরটির বাসিন্দারূপে থাকতে পারে, কিন্তু তারা সমস্ত জিনিসপত্রের মালিকানা দাবি করতে পারে না।

আধুনিক সমাজের ভ্রান্তি হচ্ছে, প্রকৃত মালিক সম্বন্ধে অজ্ঞতা। তাই এই সমাজে যে মতবাদেরই প্রতিষ্ঠা করা হোক না কেন, তাতে সমস্যাগুলির সমাধান হবে না। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে প্রকৃত মালিকের সন্ধান দেওয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে যে, ভগবান হচ্ছেন সব কিছুর মালিক। আর সেই সঙ্গে তিনি হচ্ছেন, 'সুহৃদং সর্বভূতানাম্'– সমস্ত জীবের পরম বন্ধু। জীবের প্রতি ভগবানের যে সৌহার্দ্য, তাতে কোনরকম স্বার্থপরতার আভাস নেই। সন্তানের প্রতি পিতার করুণা যেভাবে বর্ষিত হয়, জীবের প্রতি ভগবানের করুণা তার থেকে অনেক অনেক বেশী পরিমাণে বর্ষিত হয়। কেননা তিনি হচ্ছেন প্রতিটি জীবের পরম পিতা। পিতাকে সমস্ত পরিবারের সব কিছুর মালিকরূপে জেনে সন্তান-সন্ততিরা যেমন পরস্পরের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে যুক্ত হয়ে সুখ–শান্তিতে বসবাস করতে পারে, তেমনই ভগবানকে পরম পিতারূপে জানতে পারলে সারা জগতের সমস্ত জীব সুখ শান্তিতে সহাবস্থান করতে পারবে।

ভগবান কোন অবাস্তব কাল্পনিক বস্তু নন। পক্ষান্তরে তিনি হচ্ছেন পরম সত্য। তাঁর সম্বন্ধে বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে–

'বেদ্যং বাস্তবং বস্তু অত্র'– তিনি হচ্ছেন পরম বাস্তব, পরম তত্ত্ব। তিনি হচ্ছেন 'সর্বলোক মহেশ্বর'– সব কিছুই যে তাঁর, সেই সত্য উপলব্ধি করে যদি আমরা সব কিছু তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন করি, তখন আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তিনি আমাদের সমস্ত অভাব পূরণ করেন। এই জড় জগতের কোন বস্তুর প্রয়োজন তাঁর নেই। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন করার মাধ্যমে আমরা যখন তাঁর প্রতি আমাদের আনুগত্য এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, তখন তিনি প্রীত হন। কিন্তু তা না করে যদি আমরা তাঁর সম্পত্তি অপহরণ করি, তখন প্রকৃতির হস্তে আমাদের নির্যাতিত হতে হয়।

এই জড় জগৎ হচ্ছে একটি কারাগারের মতো, যেখানে জীব ভগবানের আইন অমান্য করার জন্য দন্ড ভোগ করে থাকে। কারাগারের তত্ত্বাবধান যেমন রাজা নিজে করেন না, পক্ষান্তরে তাঁর কর্মচারী কারাধ্যক্ষের মাধ্যমে সম্পাদন করেন, তেমনই এই জড় জগতের পরিচালনাও ভগবান নিজে করেন না; সেই ভার তিনি ন্যস্ত করেছেন তাঁর পরিচারিকা প্রকৃতি বা মহামায়ার উপর। জীব যত ভগবদ্বিমুখ হয়, মহামায়া তত কঠোরভাবে তাদের দণ্ড দেন। সুতরাং ভগবানকে না মেনে মানুষ যতই বিরুদ্ধাচারণ করে, প্রকৃতির নিয়মে তাদের দুঃখ-দুর্দশাও ততই বাড়তে থাকে। আমাদের চোখের সামনেই আমরা তা দেখতে পাচ্ছি। পৃথিবীর সর্বত্র আজ যে অশান্তির আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে।, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে মানুষের ভগবদ্বিমুখতা। ভগবানকে অবমাননা করে যে মতবাদই আমরা প্রতিষ্ঠা করি না কেন, তাতে কোন কাজ হবে না। কিন্তু ভগবানকে মেনে নিয়ে, ভগবানের নির্দেশ অনুসারে আমরা যদি জীবন-যাপন করতে শুরু করি,তা হলে আমরা দেখতে পাব সব ক'টি মতবাদ তাদের আদর্শ রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

বৈদিক সাম্যবাদ

আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদ অনেক বেশী কিন্তু চাহিদার তুলনায় খুবই কম।

কেবলমাত্র অন্ন এবং বস্ত্রের সংস্থান করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য নয়। প্রকৃতিতে খাদ্যের অভাব নেই। মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রানী-সমাজে খাদ্যাভাব দেখা যায় না। প্রকৃতিতে মানুষ ছাড়া আর কোন প্রানীকে সাধারনত অনাহারে থাকতে দেখা যায় না। একটি হাতির প্রতিদিনের খোরাক হচ্ছে তিনশ' কিলো খাবার আর একটি পিঁপড়ের খোরাক হয়তো এক দানা চিনি। প্রকৃতি যেমন পিঁপড়ের এক দানা চিনি যোগাচ্ছে, তেমনই হাতির তিনশ' কিলো খাবারও যোগাচ্ছে। প্রকৃতিতে হাতি অথবা পিঁপড়ে কাউকেই অভুক্ত থাকতে হয় না। কিন্তু মানব সমাজেই কেবল অভাব দেখা যায়। মানুষের এই অভাবের মুল কারণ হচ্ছে মানুষের লোভ। যে মানুষের প্রয়োজন দিনে এক মুঠো চাল, সে যখন তার গুদামে একশ টন চাল মজুত করে রাখে, তখন চালের অভাব হওয়া স্বাভাবিক।

প্রকৃতি সকলের জন্যই একটা বরাদ্দ নির্ধারিণ করে দিয়েছে। কিন্তু কেউ যখন সেই বরাদ্দটি নিয়ে সন্তুষ্ট না থাকতে পেরে অপরের মুখের গ্রাস অপহরণ করে নিজের পুঁজি বাড়াতে থাকে, তখনই অভাবের সৃষ্টি হয় - যাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া হল তাদের অনাহারে থাকতে হয়। তাই মানব সমাজেই কেবল এই অভাব এত প্রবলভাবে দেখা দেয়।

আপনি যদি রাত্রিবেলা এক বস্তা চাল রাস্তার উপরে রেখে দেন,তা হলে পরের দিন সকালে প্রথমে কয়েকটি পাখি এসে তাদের যতটুকু প্রয়োজন খেয়ে চলে যাবে, তারপর কয়েকটি গরু, ভেড়া ইত্যাদি পশু এসে তাদের যতটুকু প্রয়োজন খেয়ে চলে যাবে, কিন্তু যখন একটি মানুষ এসে সেই বস্তাটি দেখতে পাবে, তখন সে পুরো বস্তাটি নিয়ে চলে যাবে। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় মানব সমাজের অভাবের কারণ কি।

মানুষের এই প্রবৃত্তিটির কারণ কেবল লোভ নয়। তার আরেকটি কারণ হচ্ছে অনিশ্চয়তা । মানুষ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারে। তাই তার মনে ভয়ের উদয় হয়- 'কালকে আমার খাবার জুটবে কোথা থেকে?' তাই সে 'আজকের' খাবার পেয়েই তৃপ্ত হয় না। সে কালকের, পরশুর- সারা জীবনের খাবার সঞ্চয় করে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু সে যদি জানতো যে, তার খাবারের সমস্ত বন্দোবস্ত একজন করে রেখেছেন, তা হলে আর দুশ্চিন্তা করতে হত না। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির মাধ্যমে ভগবান সমস্ত প্রয়োজনগুলি মেটাচ্ছেন। পিতা যেভাবে তাঁর সন্তানদের প্রতিপালন করেন, আমাদের পরম পিতা ভগবানও তেমন পরম স্নেহে আমাদের প্রতিপালন করছেন। কিন্তু অজ্ঞানের প্রভাবে আচ্ছন্ন থাকার ফলে তাঁর সেই করুণা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি না। পক্ষান্তরে, আমরা নিজেদের চেষ্টার মাধ্যমে আমাদের কল্পিত অভাবগুলি পূরণ করার চেষ্টা করছি। ফলে বৃথা শ্রম হচ্ছে, কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না।

কেউ হয়ত সে সম্বন্ধে বলবেন, আমরা যদি চেষ্টা না করি তা হলে আমাদের অভাব মোচন হবে কি করে? হ্যাঁ, চেষ্টা

বাকী অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ত্রৈমাসিক

বৈদিক তত্ত্বদর্শনের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় পত্রিকা-

অমৃতের সন্ধানে

আপনাকে প্রকৃত শান্তি লাভের সন্ধান দিচ্ছে, কিভাবে এই দুঃখময় জগতে থেকেও চিরসুখী হওয়া যায়-

এতে থাকছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনতত্ত্ব ব্যাখ্যা, দেশ-বিদেশের খবর এবং অন্যান্য কৃষ্ণভাবনামৃত প্রবন্ধ, কাহিনী, এবং কৃষ্ণভক্তের জীবন-চরিত, এছাড়া আরও অনেক কিছু।

অত্যন্ত প্রাঞ্জল পত্রিকাটি সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে এবং বহু মণিষী এই পত্রিকাটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। 'ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে' পত্রিকাটির বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা- রেজিঃ ডাকে ১১০/- টাকা, পাঁচ বৎসরের জন্য ৫০০/- টাকা, ১০ বৎসরের জন্য ১০০০/- টাকা এবং সারা জীবনের জন্য ৫০০০/- টাকা। প্রতি কপি পত্রিকার ভিক্ষা মূল্য ২০/- টাকা। বছরের যে কোন সময় ডাকযোগে গ্রাহক হওয়া যায় এবং যে কেউ নূন্যতম ১৫কপি পত্রিকা পর্যন্ত ভিপি ডাকযোগে গ্রহন করার মাধ্যমে এজেন্ট হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত মহিমা প্রচারে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

- ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ-

শ্রী রামেশ্বর চরণ দাস ব্রহ্মচারী
ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে
স্বামীবাগ আশ্রম, ৭৯,৭৯/১ স্বামীবাগ রোড, ঢাকা- ১১০০, মোবাইল ঃ ০১৯১৭৫১৮৮২৭

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিত।
অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০॥
অর্থ : হে গুড়াকেশ, আমিই সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মা। আমিই সর্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্ত।